দিয়ানে হেব্‌রে

দিয়েনে হেব্রে

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

পরিবেশক
পাণ্ডুলিপি
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬১

মুদ্রক
অশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায়

জগন্নাথ চক্রবর্তীকে

সূচী

ভুত

নক্ষত্র দেখছেন। হাঁ করে নিশ্চেষ্ট বুঝতে পারছেন চোখের পাতা শিরশির করছে। এমন হয় যখন ভেতরে কিছু একটা ভাবনা আসে, যায়। আজ সে রকম আসা-যাওয়া চলছে, কারণ, কাল অবধি তিনি ভাবতেই পারতেন না কোনো নতুন বৌ ফিসফিস করে বলেছে সে ভূত দেখেছে। অথচ এ বাড়ির নতুন বৌটি যখন গত রাতে বাথরুমের তাড়নায় উঠেছিল, হঠাৎ ভূত দেখেছে, কোনো ভুল নেই, এ বাড়িতেই দেখেছে মধ্যের কামরার ঠিক দোরগোড়ায়, পলকের তরে। উস্কোখুস্কো চুল, চোখে চশমা, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি—কিন্তু মুখটা আঁকিবুকি, কিছুতেই আকার দেওয়া সম্ভব হয়নি, ওই মুহূর্তের দেখায়। যা হয়, ভয় পেয়েছিল নিমেষেই। স্তিমিত বিয়ে বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে। উৎসব বোঝা গেলেও সবকিছু তখন নেভানো-বোজানো। কিন্তু ভূত দেখার ব্যাপারটা এত সত্যি যে, দিল্লি শহরের বর্ধিষ্ণু উচ্ছ্বাসে দাঁড়িয়েও কিছুতেই সে সাহায্য পেল না বিজ্ঞানের, বরং বিজ্ঞান যেন স্পষ্ট করে ভূতের পক্ষে দাঁড়িয়ে ১. ২. ৩. করে যুক্তি বলে গেল মস্তিষ্কের অজস্র জটিল কানে। নতুন বৌয়ের বাথরুম যাওয়া হল না, শরীরের তীব্র সেই ধর্ম, যার জন্যে ঘুম ভেঙেছিল তলপেটের ওজনে, মিলিয়ে গেল ওই ভয়ে। আর তখনই সে প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু কিছু বলার মত লোক দেখল না তক্ষুণি, যারা শুয়েছিল ওকে নিয়ে, তাদের মধ্যে। রাতটা ফুলশয্যার আগের রাত—স্বামী-সঙ্গহীন। আগামী কাল ফুলশয্যা, যদি কাল ভূত দেখত তাহলে অনায়াসে বিষয়টা নিয়ে স্বামী সান্নিধ্যের চরম ব্যাপারগুলোয় নতুন মাত্রা দেওয়া যেত হয়ত বা।

ভাবলেন, বৌটি এরকমই ভেবেছিল ভূত দেখার পর। তাঁর প্রৌঢ়তা তাঁকে ভাবতে উসকে দেয় এভাবেই। প্রৌঢ়ের নামটা জানা

উচিত কারণ তাঁর একটা রেশন-কার্ড রয়েছে। নাম বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথবাবু। এবং বিশ্বনাথবাবু নক্ষত্র দেখছেন। দেখতে দেখতে ভূত দেখার কথাটা মনে হচ্ছে। নতুন বউ কি তেমন কিছু অসম্ভবকে দেখেছিল? নাকি নস্টালজিক বাল্যকালে ফিরে গিয়েছিল মধ্যরাতে? শরীরে এখনো শান্ত ভাটফুলের বেগুনি আভা, পা আলতা-পীড়িত লক্ষ্মী-লক্ষ্মী, হাতের কনুইতে ভাঁজ নেই বরং তেলতেলে, শুধু মুখটা ······বিশ্বনাথবাবু নক্ষত্র থেকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ······শুধু মুখটা···তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে বলবেন। আজকেই নাগাসাকি-দিবস পালিত হয়েছে, বসে বসে ট্রানজিসটারে শুনেছেন, তারপর থেকে সব মুখই বিভৎস মনে হচ্ছে। প্রৌঢ় বিশ্বনাথবাবু নতুন বৌয়ের মুখটা হারিয়ে ফেললেন তুলনার কোনো হদিশ করতে না পেরে। বেনারসী পরে শুয়েছিল কিনা ভাবলেন। কতটা মানিয়েছিল তাকে? সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, ওটা প্রতীক, আসলে যৌনতা, সন্তান, পরস্পরকে ছিঁড়ে পেড়ে ফেলার ব্যাপার। ঠিক তখনই, অর্থাৎ শুরুতেই উস্কোখুস্কো এক ভূত দেখল বৌটি মধ্যের কামরার দরজায়?

কথাটা প্রথমে সহানুভূতি কুড়িয়েছিল, যেমন হয় আর কি নতুন নতুন। কিন্তু খুব সহজে এত বড় একটা ব্যাপার চুকল না। সত্যিই বড় হয়ে উঠল। কারণ বাড়িতে ভূত দেখার অর্থ দাঁড়ালো দুটি। (১) এমন বাড়িতে হঠাৎ অপদেবতা? (২) নতুন বৌয়ের হিস্টিরিয়া নেই তো? ডাল পালায় লতিয়ে জড়িয়ে কথা দুটি এগিয়ে চলল আত্মীয়-স্বজনের মুখে মুখে। কৌতূহল বাড়ল বাড়ি এবং বৌ সম্পর্কে। বাঁদর শিশুকে টিট্ করার জন্যে অনেক বাপ-মা ভূত-দেখা বাড়ির কথা শোনায়, বলে, ও-বাড়িতে দিয়ে আসবে। এভাবে শিশুমহলে রূপকথার অলীক গল্পের সামান্য কিছু ভগ্নাংশ সত্যি হয়ে উঠল এবং তা নাগালের মধ্যেই। ভয়ে ভয়ে ওরা হিম হয়ে থাকে। শিশুরা কেন, সাবালক দীন-দরিদ্ররাও বিশ্বাসের বদৌলতে ভূত মানল পরম উৎসাহে—'কেমন! এখন বল না দেখি ভগবান নেই? উড়িয়ে দিলেই হল? স্বচক্ষেই তো ভূত দেখা গেল।' আবার এলিটরা ভয়ংকর ঠাট্টা করেও, নিভৃতে ভাবল, দেয়ার আর মোর

থিংস···বিজ্ঞান শেষ কথা বলে নি, রিলিজিয়ান সম্পর্কে মার্কসিস্ট-রাই আসলে ইললজিক্যাল, এণ্ড দে আর আফটার অল টোটোলিটা-রিয়ান। চার্চের উচ্ছেদ হয়েছে সোস্যালিস্ট কাণ্ট্রিতে? ইউ কাণ্ট ইরেজ গড—আত্মার একটা অস্তিত্ব তো রয়েইছে, সুতরাং বৌটি যে মিথ্যে বলেছে—আই কাণ্ট সে ভেরি পজিটিভলি···ম্যাম বো ইটালিয়ানো হে-ই···জনৈক এলিটের মেয়ে এরকম গান গাইছিল সকালেই ওর পড়ার ঘরে—তাতে করে ঈশ্বর হারিয়ে যায় না, রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটে মাননীয় সেই এলিট স্ট্রোকের পরই কয়েকবার গেছে, স্বামীজিদের কঠোপনিষদের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট অনুভব করেছে দেয়ার ইজ গড···হেনস, কেউ কোথাও ভূত দেখবে না এটা হতেই পারে না।

বিশ্বনাথবাবু হেলান দেওয়া থেকে আবার সিধে হয়ে বসলেন। মেরুদণ্ডি প্রাণীদের যদেচ্ছ মোচড় খাওয়া সম্ভব নয়, ভাবলেন তিনি, এবং মেরুদণ্ডি প্রাণীদের প্রতি ক্রোধ জন্মাল তৎক্ষণাৎই। কেঁচোর মত অনায়াস হতে পারলে প্রৌঢ় এই নাগরিকটির চেয়ারে এমন কষ্ট-কর ভাবে বসে থাকতে হত না, কখনো হাতল জড়িয়ে কখনো পায়া জড়িয়ে খুশীমত তিনি উল্টোপাল্টা অবসর যাপন করতে পারতেন। মানুষের সীমাবদ্ধতা যে কি মারাত্মক, ভাবতেই, তাঁর মনে অনেক-গুলো যুক্তি এল আত্মহত্যার এবং গভীর নিঃশ্বাস ফেলে মৃত্যুর জন্যে বিরহ অনুভব করলেন। মৃত্যু, কোথায় পাব তোরে? আবার নক্ষত্রের দিকে চোখ চলে গেল। নক্ষত্র দেখছেন।

ইতিমধ্যে প্রায় মাস দুই কেটে গেছে সেই ভূত দেখার রাতের পর। বৌটি এখন বেশ ঘরোয়া, ভোর পাঁচটায় ওঠে (ঘড়িতে এলার্ম থাকে), সারাদিন কাজকর্ম নিত্যকর্ম ইত্যাদি এবং মাঝে মধ্যে ননদ প্রভৃতিগণের সঙ্গে সিনেমা-বাইস্কোপ, মোগলাই পরোটা, ফিশফ্রাই—যেমন চলে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন, চলছে। কিন্তু ভূত দেখার ব্যাপারটা মেটেনি, বেড়েছে প্রায় গাঁ-গঞ্জের খরায় জন-মুনিষদের ঘরে আগুন লাগার মত দাউ দাউ। সকলেই তটস্থ। অমাবস্যা এলে

(জেনে রাখুন মধ্যবিত্তরা অমাবস্যা পূর্ণিমার খবর রাখেন নিভু'ল) বয়স্ক/বয়স্কাদের মুখে অন্যধরণের কুঞ্চন। বউয়ের দিকে তাকানোর ভাবভঙ্গীতে ভাঙন দেখা দেয়, বহুরকম চিন্তার টানাপোড়েন চলে সবায়ের। বাড়িতে অপদেবতার স্থিতি নিঃসন্দেহে সবাইকে অস্বস্তিতে রেখেছে, ভয়ংকর বিরক্তি সেই বউকে ঘিরে, প্রায় মার-মুখি হয়ে ওঠে সকলে, অসভ্যের মত ঝগড়াঝাটি হয়। সেইসব চরম বিরক্তির দিনে এবং বেচারি বৌ, যে কলেজে কিছুদিন পড়েছিল, ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্যা ছিল এবং উম্যান-লিব শব্দটা শুনেছিল, কুঁকড়ে মরে যায় যেন, আবহাওয়ার চাপে, অশেষ লজ্জায়। ভাবে, কথাটা, মানে ভূত দেখার কথাটা, কেন যে সে বলতে গেল, এবং এখন কখনো কখনো মনে হয় সত্যি সে ভূত বা তেমন কোনো অপ্রাকৃত বস্তু সত্যিই দেখেছিল? অথচ আশ্চর্য—তার বিশ্বাস সে দেখে-ছিল—এবং ভূতই দেখেছিল। ভুল নেই।

প্রৌঢ় বিশ্বনাথবাবু এসবের কিছুই খবর রাখেন না, তবে ভূতের ব্যাপারটা যে নিতান্তই হাস্যকর, তিনি জানেন। কিন্তু কাকে কে বোঝাবে—সকলেই বিশ্বাস করতে মুখিয়ে রয়েছে, দু একবার যে প্রতিবাদ করেননি, তা নয়, তাতে তাঁর অন্ন বন্ধ হয়ে যাবার ভয় জেগেছিল। তিনি এখন পরাশ্রয়ী, পঁয়তাল্লিশ টাকা পেন্সানের প্রেক্ষিতে। সুতরাং তিলে তিলে যা গড়ে উঠছে তাকে পাশ কাটিয়ে তিনি একাকী, আকাশে তাকিয়ে থাকেন সন্ধের পর থেকে, দিনে গুটিয়ে থাকেন আড়ালে-আবডালে। আলো তাঁর ভালো লাগে না, কষ্ট হয়, কামনা করেন অহোরাত্র রাত থাকুক।

মানুষ অবস্থার চাপ বেশীদিন সহ্য করতে চায় না নিজের কাঁধে রেখে। পরিত্রাণ খোঁজে। ভূতের ব্যাপারেও কিছু একটা পরিত্রাণ চাইল সবাই। জোগাড়-যাগাড় করে বাড়িতে পুজোর ব্যবস্থা হল এবং গুরুদেব মার্কা একজনকে আনা করানো হলো। গুরুদেবের চেহারা দূর থেকে সাহেবের বাচ্চার মত কিন্তু কাছে এলে ভ্রমের শেষ হয়। শ্বেতি। চামড়ার মূল রঙ খেয়ে গেছে রোগের ঝাপটা। তাতে কিন্তু শরীরে অন্য ঘাটতি প্রবেশের পথ পায় নি। থলথলে ফুলো ফুলো দেহ-তরী। হাস্য-মুখ, গায়ে সিল্ক-সিল্ক

মত চাদর, ঘি রঙের। সব মিলিয়ে প্রেজেন্টব্‌ল। তিনি পুজোর উদ্দেশ্যে বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র একটা চাপা উল্লাস বয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই এবং তীর্যক তাকালো বউটির দিকে। যেন রমণীটি এইবার জব্দ হবে। ভূতকে বাড়ি ছাড়া করতে পারলেই বৌটাকে সংসারে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। বেচারি ভয়ে ভয়ে গুরুদেবের দিকে তাকাল। গুরুদেব ওর দিকে আগেই তাকিয়েছেন, তাকাবার একটা প্রক্রিয়া আছে তাঁর। সেটা শুরু হয় স্তন দিয়ে। স্তনের মধ্যে ডুবে থাকেন খানিকক্ষণ, তারপর কোমর। যদি মনোমত হয় তাহলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন, অভয় ছড়িয়ে দেন পরিবেশে। তা না হলে গম্ভীর থাকেন শেষ অবধি, দক্ষিণা গ্রহণ পর্যন্ত। ওরকম অবস্থায় সকলের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে পুজোর ফলাফল নিয়ে। গুরুদেব সমস্ত বোঝেন এবং বিদায়ের প্রাক্কালে বলতে থাকেন, 'দেখুন ঈশ্বরের কি ইচ্ছে, পুজোটা ছাড়বেন না, গৃহশুদ্ধির জন্যে বেদ পুরাণে যা আছে, সে পথে চলুন, সাধু সন্ন্যেসীরা এমত বিধানই দিয়েছেন, অঙ্গীরস ঋষির ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটেনি, বেদের ব্রাহ্মণ অংশে স্পষ্টই লেখা দেখবেন, তবে ক'জন আর ওটা দেখে, বেদের সংস্কৃত তো একেবারেই আলাদা, তাঁর করুণা না হলে, জানেনই তো, বেদপাঠ নিস্তাই মূর্খামি, কোনো উপলব্ধিই জাগবে না...' চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে শুনতে শুনতে, অর্থ খুঁজে পায় না কোথাও এতটুকু, তবে সকলেই অনুভব করে ঈশ্বর বেদ ইত্যাদি কত শক্তিমান এবং এই গুরুদেবই শেষ অবধি ভরসা। আজকের পুজো-পাঠে এসে, সব দেখে গুরুদেব মৃদু মৃদু হাসলেন। পুজো শেষ করেও সেই হাসি-হাসি মুখে দক্ষিণা নিলেন, বৌটির গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'যা, আর ভয় নেই, কারুরই আর ভাবনা থাকল না, অতৃপ্ত আত্মা ছিল, এবার গেছে। তোর দিকেই টান পড়েছিল—'

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শ্বাশুড়ির মনে কিন্তু খচ করে লাগল কথাটা।

নক্ষত্রের গা থেকে ধুলো সরে যায় বর্ষার ঠিক শেষাশেষি। খুব

ঝকমক করে এবং নিচেও যেন নেমে আসে। বিশ্বনাথবাবু নক্ষত্র দেখতে দেখতে এটা আবিষ্কার করেছেন। ভারি খুশীর ব্যাপার। নক্ষত্রদেরও তা'লে ওঠানামা আছে? কখনো বেশ ধোপদুরস্ত, কখনো কালি-ঝুলি! জীবনের মত অনেকটাই। খুশীতে হাততালি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল আবিষ্কারের গোড়ায়, গানও গেয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেন নি। এমনিতেই, খোশমেজাজে রয়েছেন, কারণ ভূতের ব্যাপারটা চুকেছে। বৌটি এখন অনেকটা সপ্রতিভ। একদিন সবাইকে আইস্ক্রিম খাইয়েছে, দুপুরে, আইস্ক্রিমঅলাকে ডেকে। বিশ্বনাথবাবু অবশ্য পান নি, কারুরই মনে থাকে না ওঁকে। তা না থাক, বৌটি যে ভূতের অনুষঙ্গ থেকে রেহাই পেয়েছে তাতেই তিনি খুশী। চেয়ারে বসে খুব পা নাচান আজকাল সেই কারণেই এবং কখনো কখনো নিজের অতীত ভাবেন নক্ষত্র ভুলে। বলার মত কিছু না, বাবা একবার পাগল হয়ে, স্কুলে, ওঁরই ক্লাসের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, চমৎকার লাগে কথাটা ভাবতে।

বিশ্বনাথবাবুর অতীত যখন তেমন কিছু না, তাহলে আবার নক্ষত্রে ফিরতে হয়। তিনি ফিরেও আসেন। কিন্তু ভূতহীন নক্ষত্র দেখার রাত ক্লান্তিকর ঠেকছে, কেন? নক্ষত্র দেখার মধ্যে যে একটা একঘেয়েমি ছিল তা বড় স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে ভূতের ব্যাপারটা। বেশ একটা টেনসান ছিল এতদিন, জীবনের ধুকপুকানি তাতেই যেন রোমাঞ্চকর, ইচ্ছে করে টিকে থাকতে। টিকে থাকার জন্যেই কি মানুষ একটা হৈ-হট্টগোল খোঁজে? বিশ্বনাথবাবু এভাবে কোনো দিন ভাবেন নি, এখন ভাবছেন। কিন্তু ভূত গেলেও অন্য আরেক ঘটনা তলে তলে এগিয়ে আসছিল সংসারে। বৌটি সম্পর্কে কিছু নতুন কথা। গুরুদেবের শেষ কথাটা শ্বাশুড়ি ভুলতে পারছেন না। 'তোর জন্যই এসেছিল'। মরে গিয়েও বৌটিকে যে ভুলতে পারেনি, নিশ্চয় সে জ্যান্ত থাকতে বউটিকে ভুলত না। ব্যাপারটা এভাবেই চারিয়ে যেতে থাকল গৃহকর্ত্রীর মনে। দিনে দিনে। হাসি খুশীর অন্তরালে বৌটির অন্য এক চেহারা ওঁর মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। কেমন একটা চরিত্রহীনার অবয়ব। বিয়ের আগে

ছেলেমেয়েদের মেলামেশা, সেই মেলামেশার সূত্র ধরে কত কি যে হতে পারে, শরীরকে তো ঘরে ফেলে রেখে বাইরে আসতে পারে না কেউ, ওটাই আসল বস্তু মেলামেশার, আকর্ষণের। ভাবল, ছিঃ, ছেলেকে একটা বেশ্যা এনে দিলেন শেষ অবধি। নিজেকে মারাত্মক অপরাধী মনে হল। আর এই অপরাধ বোধ থেকেই শরীর মন ঘুলিয়ে উঠে এল ঘৃণা—বৌটিকে দেখলেই কর্ত্রী যেন বেশ্যা দেখেন। ভাবনা একা একা কিছুদিন বহন করার পর বুঝতে পারলেন না কিভাবে এর থেকে রেহাই পাবেন, অসহ্য হয়ে ওঠে নিজের কাছে। কিন্তু সবটাই এত প্রমাণহীন আন্দাজি যে, ভূতকে নিয়ে সন্দেহটা হাস্যকর মনে হওয়ায় সম্ভাবনা ষোল আনা জেনে কাউকে কিছু বলছেনও না, অথচ তিনি স্থির নিশ্চিত যে ঘটনাটা তর্কাতিত সত্যি। সুতরাং কিভাবে বললে তাঁর ছেলেরা বিশ্বাস করবে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই ছেলেই, ভেবে চললেন অনবরত। ফলে বিশ্বাস-যোগ্য একটা কাহিনী, যে কাহিনী চরিত্রহীনার, তাঁর মাথায় বেশ জমে উঠল। কাহিনীটি অন্যের মনে ধরবে কিনা পরখ করার জন্যে একদিন দুপুরে ছাদে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস করে ঝিকে বললেন। সে চোখ বড় বড় করে অবাক, 'সত্যি তুমি নার্সিং হোমে তল্লাস করেছ, দু মাসের মাথায় খালাস করিয়েছিল ?'

'দুবার। আর দুবার দুজন ওকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ভাবতে পারিস ? একজন হলে না হয় মানতুম, কিন্তু দুজন ? এ মেয়েকে কি বলবি তুই ?'

'বিয়ের আগে খোঁজ নাও নি তোমরা ?'

'এসব কি খোঁজ করলেই তক্ষুণি জানতে পারা যায় ?'

'তা'হলে এখন জানলে কোত্থেকে ?'

'পাপ কি চাপা থাকে ?'

'তা যা বলেছ। ভগবান আছে না ! ধর্মের কল—'

'এই পাপ আমায় সংসারে তুই পুষতে বলিস ? জেনে-শুনে ?'

'উপায় কি বল ? তোমরা তো আমাদের মত নাও, তাই বা কেন, এখন তো বিয়েটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

'অনেক কিছুই করা যায়···কিন্তু এত সহজে মিটতে দেব ?

আমাকে যেমন ঠকিয়েছে, আমিও…'

এটুকু বলেই, কর্ত্রী ঝিয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন, থমথম করছে গোটা ছাদটা যেন। তারপর ঝিকে বললেন, 'দেখিস অন্য কান যেন না হয়—তোরা তো কেচ্ছা পেলেই', এটুকু বলেই শেষ করলেন। ঝি কিছু বলল না, তবে মিনিট দুই বাদে বলল, 'তোমাদের বাড়িতে আমি তো নতুন না', নিজের বিশ্বাস-যোগ্যতার জন্যে এটুকুই কর্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিল। ঝিয়ের সঙ্গে এমন বিজনে আর একটু সময়ও থাকা উচিৎ নয় ভেবে তিনি নেমে গেলেন ঝিকে পাশ কাটিয়ে, কোনো জবাব না দিয়ে এবং চলে যাওয়ার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা অনুভব করল ঝি। সে আরো কিছুক্ষণ ছাদে থাকল, দড়িতে কাপড়-মেলে-দেওয়া কাপড় টেনেটুনে সময় কাটাল।

কয়েকদিন পরে এই ছাদেই কর্ত্রী তার বিবাহিত ছেলেকে ডেকে আনলেন, সংসারের চোখ এড়িয়ে, সেই সেদিনকার মত। মুক্ত আকাশের তলায় ছেলের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আশেপাশের বাড়িতে আলো। পড়াশোনা, টি ভি রয়েছে রোজকার। রাস্তায় সাইকেল-রিক্সা, লোক। সামান্য দূরে ছেলে-ছোকরাদের গুলতানি। হঠাৎ দূর থেকে ওদের দেখে, কেউ ঠাট্টা করে বলতে পারে কর্ণ-কুন্তি সংবাদ। নানা উদ্ভট সুরসরি-দেওয়া তুলনা লোকের ভাল লাগে, মাথায় আসে। কিন্তু কর্ত্রী প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তিনি ছেলেকে নিবিষ্ট চেয়েই রয়েছেন, খেলা শুরুর আগে এই দেখা, জেতার জন্যে খেলোয়াড়ি তোড়জোড় যেন।

'তোকে একটা কথা বলব, বড় নোংরা কথা। শোনার আগে আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এ-কথা নিয়ে কারো সঙ্গে টু শব্দটি করবি না।'

'আহা, আগে বলবে তবে তো'

'না, আমাকে ছুঁয়ে কথা না দিলে, দরকার নেই তোর শুনে'

'কি এমন সাংঘাতিক কথা'

'কথা দে'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাউকে বলব না'

'ওরকম গা এলিয়ে দিয়ে বললে চলবে না, আমায় ছোঁ, তারপর বল,

এভাবে কিছুটা সময় নাটকীয় খেয়ে গেল। তারপর ছেলেকে গুছিয়ে কাহিনীটি বললেন তিনি, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দুজনেই বলা শেষ হলে। হঠাৎ চারদিকটা খুবই নিঃশব্দ মনে হল ছেলের। অবশ্য সামান্য ক্ষণের জন্যে, আবার যেমন-কে-তেমন।

'তাহলে কি করতে বল এত সব জানার পর, আমাকে'

'তোর বৌ তুই বুঝবি'

'তাহলে তুমি কেন এত করে বলতে গেলে ?'

'তুই আমার বংশের, আমার রক্তের, এটা আমার কর্তব্য। তোর মরা বাপের কথাটা ভাব। তাঁর বংশে একটা বেশ্যা···এ পাপ সর্বনাশ ডেকে আনবে বুঝতে পারিস না ?'

'তাহলে তো একটাই রাস্তা। ডিভোর্স চাইতে আদালতে যেতে হয়'

'জ্ঞাতি-গুষ্ঠির কাছে মুখ দেখাতে পারবি ? তাছাড়া ও কি স্বীকার করবে ? প্রমাণ নিশ্চয় আগেই লোপাট করে রেখেছে'

'তাহলে আমি কি মাথার চুল ছিঁড়ব ?'

'তোকেই ভাবতে হবে একটা বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন রাখবি, আর যদি রাখতে না চাস, কি তোকে করতে হবে। তোর মরা বাপের, বংশের কথা নিয়ে লোকে রসিয়ে রসিয়ে এখনই হয়ত কীর্তন গাইছে —সহ্য হয় ভাবলে ? আমাকেই গলায় দাড়ি দিতে হবে।'

শেষ তাস, ছেলে এবার তাস ফেলুক।

সময় হাঁটছে না, দৌড়চ্ছে। রাত্রে বৌকে পাশে রেখে সে ভাবল, অতীত অতীত। মা-ও অত সহজে গলায় দড়ি দেবে না। লোকেরও বয়ে গেছে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে। ক'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে

যাবে, মা-ও সয়ে নেবে বৌকে। কিন্তু বৌয়ের গায়ে হাত দিতে গিয়ে হাতটা আপনি থমকে গেল। মরা বাপের মুখটা মনে পড়ল। এতদিনকার বিশ্বাসগুলো থেকে অত সহজে ছাড়ান পাওয়া যায় না। বৌকে ছুঁতে ঘেন্না হচ্ছে যেন। ঠিক ঘেন্না না কেমন একটা হাত-টেনে-ধরা অবস্থা। বাবার মরা মুখ, তার পেছনে বাবার বাবা, তাঁর পেছনে তাঁর-তাঁর বাবা। এমনি সারবন্দী মুখ ভেসে উঠতে চাইছে তার গলায় পা রেখে।

সে-রাত কাটল দ্বিধায়। একজন ঘুমোল নির্ভাবনায়, আর একজন চোখের পাতা এক করতে পারল না। পরের রাতও এভাবে কাটল। তৃতীয় রাতে বৌ যখন না ঘুমিয়ে বুকের কাছে সরে এসে গলা জড়িয়ে ধরতে গায়ে হাত রাখল, টের পেল মানুষটার শরীর ভয়ংকর ঠাণ্ডা। হাতটা গলা থেকে নামিয়ে দিল।

'কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ?'

জবাব পেল না কথার।

'বলবে তো। আমাকেও লুকোচ্ছ?'

এবারও জবাব নেই।

'কি হল?' বৌ উদ্বিগ্ন, 'না, সত্যিই কিছু একটা হয়েছে'

'ভাল লাগছে না। সরে শোও'

'কি হয়েছে তোমার'

'কিচ্ছু হয় নি' কঠিন জবাব পেল এবার।

'হয়নি বললে হবে কেন?'

'জ্বালিও না। সরে শোও।'

হাঁ হয়ে থাকল বৌটি। জ্বালিওনা মানে? এবার ওর কান্না পেল। সে সরে শুল না। কপালে হাত রাখল।

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল। 'ছোঁবে না আমাকে।'

'ছোঁব না? কেন? না ছোঁবার কী হল?'

অন্ধকারে তড়াক করে উঠে বসল স্বামী।

'জান না যেন কিছু? ন্যাকামি।'

'কি হয়েছে তোমার বল তো?'

'কি হয়নি ? কেন তোমরা ঠকালে আমায় ? মুখে কালি দিলে সকলের ?'

'কালি দিলাম ? কি বলছ তুমি ?' যথাসাধ্য প্রতিবাদের চেষ্টা করল সে।

'শাট্ আপ। ছেনালি করার জায়গা পাও না ?'

'এসব কি বলছ ? তোমার হয়েছেটা কি ?' উঠে বসল বৌ-ও।

একটি কথাও বলবে না। তোমরা সব কটি শুয়োরের বাচ্ছা— সবাই তোমাদের লোচ্চা'

'মানে ?'

'তোমার বাপ মা, তুমি'

'বাপ-মা নিয়ে অসভ্যের মত কথা বলবে না—আগে বল এসব কথার মানে কি ?'

রাগে কান্নায় বৌটি খাট থেকে নেমে আলো জ্বাললো। ক্রমে সে বুঝতে পারছে কোথাও কিছু একটা ঘটেছে যা অপ্রতিরোধ্য তার স্বামীর কাছে, তবুও ভীষণ অপমানিত বোধ করল, লজ্জা ক্রোধ অনিশ্চয়তা তাকে প্রায় বোবা করে ফেলল। স্বামীর কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

'আলো জ্বাললে কেন ? মুখ দেখাবে বলে ? ওই পোড়া মুখ ?' অকথ্য ব্যঙ্গ এসে বৌটিকে বিঁধল।

'মুখ সামলে কথা বল।' এবার বৌটি সামলাতে পারল না নিজেকে, 'পোড়া মুখ হতে যাবে কেন ? যা ইচ্ছে তাই বলবে ?'

বিকট চিৎকার করে উঠল স্বামী, 'বেশ্যা কোথাকার ! কথা বলতে লজ্জা করছে না ? বিয়ের আগে ক'বার নার্সিং-হোমে গিয়েছিলি ? ক'বার এ্যাবরসান করিয়েছিলি ? ন্যাকা সেজে আর কদ্দিন ?'

কূল খুঁজে পেল না বৌটি। একটা শব্দেরও মানে বুঝতে পারছে না, অথচ কি ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ! সারা শরীর ঘিন ঘিন করছে, সামনে খাটে বসে থাকা লোকটাকে থলথলে প্রাগৈতিহাসিক লাগছে। সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, স্বর তীক্ষ্ম হল, 'জানোয়ারের মত কথা বোলো না। ছোটলোক, ছোটলোক যে কত তোমরা—'

'কি বললি' লাফ দিল লোকটা বিছানা থেকে।

'মারবে নাকি ?'

পাশ দিয়ে প্রায় ছুটে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা একবার এসো তো। বেশ্যাটার থোতা মুখ ভোঁতা করে লাথি মেরে দূর করি।'

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু মৃত্যু সেখানে নায়ক। সেই ঘটনায় আগুন এবং কেরোসিনকে মঞ্চ বলা যেতে পারে। বৌটিকে পোড়ানো হয়েছিল প্রথমে নির্যাতনে অজ্ঞান করে পরে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে স্টোভের পাশে রেখে, সিন্থেটিক শাড়ীর আঁচল স্টোভে দিয়ে।

বিশ্বনাথবাবু এখনো নক্ষত্র দেখেন তবে অন্ধের মত, নিজের মধ্যে।

ট্রাক

বুকের ভিতর অহরহ ধাতব একটা শব্দ। যেন ছায়াচ্ছন্ন এস্‌ফল্টের পাকা সড়কে ট্রাক চলেছে। ট্রাকের পর ট্রাক। শব্দটা চাপা আর জমাট। কখনো মনে হয় খুব কাছে, কখনো অনেক দূরে। একা নির্জন কোথাও দাঁড়িয়ে থাকলে অথবা বসে থাকলে শব্দটা এগিয়ে আসতে থাকে, তারপর একটা অবয়ব নেয়। ট্রাকের একটা চ্যাসিস যেন নেকড়ের মত তাড়া করে। সব মুছে গিয়ে শরীরের দু'পাশে টানা দুটো দেয়াল আর মাথার ওপরে একফালি আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না অমল। ভয়ানক একটা আতংক এসে ওর হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে থাবা বসায়। তবু শব্দটার মাদকতা আছে। পরিচিত প্রাত্যাহিক জীবন থেকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। মনে করিয়ে দেয় দূরে কোথাও অন্য একটা পৃথিবীতে অত্যন্ত গোপনীয় কিছু আয়োজন হচ্ছে—যা অমলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিতে পারে। ওকে দ্বিখণ্ডিত করে ছুঁড়ে দিতে পারে সময়ের নিষ্ঠুর বহমানতায়। অমল জানে ওর পায়ে পায়ে শব্দটা রয়েছে, খুব সাবধানী ও অপ্রকাশ্য যুদ্ধ চলেছে প্রায় জন্মকাল থেকেই।

সারাদিন অবশ্য শব্দটা ওকে ভয় দেখাতে পারে না। কনট প্লেসের গোল বারান্দাটায় যখন হাঁটে অথবা কোনো হোটেলের রান্নাঘর থেকে যখন ভাজা মশলার নিবিড় গন্ধ এসে বাতাসকে ভারী করে দেয় তখন আর ভয়টা থাকে না। সেই মুহূর্তে ভীষণ তাজা মনে হয় বিশ্ব-সংসারের সমস্ত সাজানো ব্যাপারগুলোকে। বাজারের বেচাকেনা, মেয়েদের লাবণ্য ও লক্ষ্যহীনতা ফুলের মত দুলতে থাকে হাওয়া-বাতাসে। অমল তখন সার্টের ঝুল টেনেটুনে নিজেকে যথাযথ করে নেয়। হঠাৎ ইচ্ছে হয় চলমান কারো কাঁধে হাতটা রেখে বলে, 'রোদ আর ডবল-ডেকারের চিৎকারে কোথায় চলেছ হে দুপুরে?' অথবা অপরূপা কোনো তরুণীর ঢালু কাঁধে মধ্যমা ও তর্জনীটা ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ভুবনকাঁপানো সুখ কি

হুইস্কির সঙ্গে খাওয়া যায়? সুখ কী খাওয়া যায় নাকি? যায় বৈকি। গিলে খেতে হয়! কেয়ার মত গিলে ফেলতে হয় রোজ রোজ।

বড় সুখী মেয়ে কেয়া। এই সুখের সংবাদ কেয়াকে প্রথম দিয়েছিল ট্রেনের কামরায় মধ্যরাত্রের অঝোর বৃষ্টি। শিখাহীন, তাপহীন, বর্ণহীন অন্ধকারে আশ্চর্য এক অনুভূতি এসেছিল ওর বুকে। ঠিক যন্ত্রণা বললে ভুল হবে, হা-হুতাস বললে কিছুই বলা হবে না—যেন নতুন কিছু। ভিজে বাতাসের দামাল ছাঁট এসে পড়েছিল জানলার কাচে। কেয়া সেদিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, এই কী সুখ? বৃষ্টিতে মাঠের পর মাঠ ভিজে কাদা হচ্ছে, সকালে হয়ত লাঙল নামবে, ধান হবে, ডোবার জলে হাঁস আর কলসী ভাসানোর খেলা দেখতে দেখতে ট্রেনটা এমনি ছুটে যাবে উদাসীন, নিরুদ্বেগ।

হাঁটুতে চিবুক রেখে সুখের খেলা খেলছিল কেয়া! ট্রেনের কামরায় সবাই ঘুমিয়ে আছে। মাথার ওপর সবুজ বালবের কৃপণ আলো। হুকে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক দোল খাচ্ছে। কেয়ার মনে হল পৃথিবীটা ভীষণ বড় আর জনশূন্য। ইতিহাসে পড়া সেই প্রাণহীন প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল। সময়টা যেন উলটো দিকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিল সেই যুগে, যেখানে ধু-ধু পৃথিবীতে একা একমাত্র মানুষ কেয়া। ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে চুলে, ভ্রূতে, কাঁধে। ঝড়ের মত বাতাস এসে ছিঁড়ে ফেলছে শরীরের মাংস। চামড়া ফেটে গড়াচ্ছে রক্ত, জ্বালা করছে চিরে যাওয়া ঠোটের ভাঁজগুলো। কেয়ার মনে হয়েছিল, এই কি সুখ?

এই ভাবনার মাঝখানেই ট্রেনটা সাধারণ একটা স্টেশনে ঢুকে আবার বেরিয়ে এসেছিল। বৃষ্টি ভেজা স্টেশনটার অবশ আলো কেয়াকে ফিরিয়ে এনেছিল সেই দূর যুগ থেকে বর্তমানে। দিল্লীতে নেমে অমলকে বলেছিল ট্রেনের কামরায় সেই সুখের ব্যাপারটা। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ইণ্ডিয়া গেট পেরিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছিল। সেখানে বসার বড় বড় পাথুরে বেঞ্চ। মাঝে মাঝে জল। এখানে বড় একটা কেউ বসে না। সমস্ত মাঠটা ফাঁকা। অমল আর কেয়া বেঞ্চিতে এসে বসে। দিল্লীর খোলামেলা আকাশ,

বিস্তীর্ণ বিপুল পথঘাট এবং মানুষজনের অভাব মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমস্ত কিছুতে যেন কেমন ছন্নতা এসে লাগে। শারীরিক অনুভূতিগুলো এলিয়ে পড়ে গভীর আলস্যে। অমল কেয়ার কথা শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল, ট্রেনের কামরায় সুখের খোঁজ পেয়েছিলে বলছ? মানে সুখের একটা কিক্?

কিক্ মানে? কেয়ার বিস্ময়।

কিক্ মানে জান না? হঠাৎ একটা সম্মোহন।

তার মানে তুমি বলতে চাও আমার এই অনুভূতিটার কোনো মানে নেই?

আছে বৈকি। ওই ফানুস ওড়ানোর মত আর কি!

তাহলে সুখ বলে কি কিছু নেই?

আছে কিনা জানিনা, তবে কোনো এক বৃষ্টি-ঝরা রাতে ট্রেনের কামরায় বসে বস্তুটাকে আবিষ্কার করা যায় কিনা সন্দেহ আছে।

তাহলে সুখ কাকে বলে?

তুমি দেখছি স্কুলের ছাত্রীর মত প্রশ্ন শুরু করলে।

এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। এই যে তুমি আমি বসে আছি এতে তোমার সুখ নেই?

এটা একটা সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ রক্তমাংসের ব্যাপার। তীব্রতাও আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বলি, তুমি আমার আ-শির-নখ জ্বালা।

কেয়া অমলের দিকে তাকিয়ে থাকে। অমলের এই কথাগুলো কেয়াকে উদ্বেলিত করে দেয়, আবার ভয়ও পাইয়ে দেয়। অমল সব বিষয়ে কেন যে ভিন্নভাবে ভাবতে চায় কেয়া বুঝে উঠতে পারে না। কেয়া অমলের কথাগুলো বুঝোবার চেষ্টা করে। কিন্তু পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না।

এই যে আমরা দুজন দুজনের কাছাকাছি থাকতে চাই, ভাবতে চাই—এসবের কোনো মানে নেই তাহলে?—কেয়ার প্রশ্ন।

আছে বৈকি! আমরা দুজন দুজনকে চাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে—দেহে-দেহে লালায়-লালসায়, ঘামে-রক্তে। কোনো কোনো মুহূর্তে

এর জন্য নষ্টও হয়ে যেতে পারি।

তবে একে তুমি সুখ বলবে না ?—কেয়া উত্তেজিত।

সুখ বলব কেন ? বলব আমাদের ঘাড় ধরে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

জানি না। তুমি যে কী বল আমি বুঝতে পারি না।

একটুক্ষণ অমলের দিকে তাকিয়ে থাকে কেয়া। বুকের ভিতর কান্না পায়। অমলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যেন ছবিতে দেখা বিশাল বুদ্ধ-মূর্তির মত আকাশ-ছোঁয়া। কেয়ার অহংকার হয়। কিন্তু যে মানুষকে মন চায় সে কেন এমন হবে ?

দুজনেই চুপচাপ বসেছিল সামনের দিকে তাকিয়ে। অমল চোখ ফিরিয়ে কেয়াকে দেখছিল মাঝে মাঝে। এভাবেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল একসময়। ওরা উঠে পড়ল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাস-স্ট্যান্ড অবধি এল, তারপর দুজন দুই বাসে।

অমলের বুকের ভিতর সেই অনবরত ধাতব শব্দটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত লেগে আছে। ভারী ভারী ট্রাকের গুম্-গুম্-শব্দ। ইদানীং শব্দটা যেন বাড়ছে। লোকালয়ের মধ্যে থাকলেও শব্দটার কমতি নেই। শব্দটা যত বাড়ছে আশেপাশের ব্যাপার ও বস্তু-গুলির অর্থও যেন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে একঘেয়ে বেঁচে থাকার আকর্ষণ। হাতের মধ্যে প্রতি-বিপ্লবের ইস্তাহার গুঁজে দিয়ে কেউ যেন ভয় দেখাচ্ছে।

অমলের সঙ্গে কেয়ার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। বিয়ে-বাড়ীতে। দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিল অমল। কেয়া তখন থার্ডইয়ারের ছাত্রী। প্রায় জোর করেই ঠিকানা চেয়ে নিয়েছিল অমল। অমলের জোরটা যেন গোঁয়ারের মত। ধরলে ছাড়বে না। অথচ যা জোর করে চাইবে তাকে পেলেই নেশা কেটে গেল। হেলা-ফেলা। তারপর দুবার মাত্র কলকাতায় এসেছিল অমল। কিন্তু কেয়ার কাছে চিঠি এসেছে অসংখ্য। এমনদিনও গেছে, যখন এবেলা ওবেলা দিনে দুবারও চিঠি লিখেছে অমল। কেয়া অবাক হয়ে যেত ওর পাগলামি দেখে। অথচ এখন যেন কেমন বদলে গেছে অমল।

কলকাতা থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়ার চাকরী নিয়ে দিল্লী এসেছে কেয়া। জয়েন করেই কায়রো না বেইরুট ফ্লাই করবে। এয়ার-হস্টেসের চাকরী। মধ্যবিত্ত মেয়ে কেয়া যে এমন একটা চাকরী পাবে এটাও আশ্চর্য ব্যাপার। অথচ চাকরীটা পেয়ে গেল। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ানোর চাকরী। কেয়ার মা নেই। মরবার সময় বলেছিলেন, ভাল হয়ে থাকিস মা। কেয়া ভাল হয়েই আছে। কিন্তু চাকরীতে জয়েন করবে কিনা তা নিয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ঝড় উঠেছিল। কেয়াও প্রথমে থমকে গিয়েছিল একটু। এ-সব চাকরীতে নাকি নানা ঝামেলা। কিন্তু আকাশের বোধ হয় ভিন্ন আকর্ষণ আছে, তাছাড়া কত নতুন নতুন দেশ দেখা, সেসব দেশের নামের মধ্যেও মাদকতা। স্পেন, আর্তেক, জুরিখ, ওহিও, রিউ-ডি জেনিরো—পর পর যেন বিদেশী ছবি। কেয়া মনস্থির করল চাকরীতে সে যাবেই।

কিছুদিন থেকেই অমলের মনে হচ্ছে সব যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। পায়ের তলা থেকে অলক্ষে মাটি সরে যাচ্ছে। পড়বার মত ভাল একটা বইও আজকাল ছাপা হয় না। মানুষের চোখ দুটো দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ—অথচ কোনো যন্ত্রণা নেই এই অন্ধত্বের জন্য। কেয়াও মাটি ছাড়ছে—মাটি তো আর ছাড়া যায় না—বৃত্ত ভাঙছে। ওর শরীর ওকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

শরীর !

আশ্চর্য একটা শব্দ ! যেন বিস্ফোরণ। অমল কোনোদিনই কেয়ার সম্পূর্ণ শরীর দেখেনি। সে জানে শরীর বলতে সাধারণ অর্থে কী বোঝায় ! কত ছোট তার সীমা। একটা গেঁয়ো মজা খালের চাইতে বেশি কিছু না। দিনে দশবার পারাপার করা যায়। কিন্তু শরীরের অন্য একটা অর্থও রয়েছে। তার জন্যেই এত মেধা স্নায়ু, একাগ্রতা। কেয়া এই রহস্যটা জানে, সব মেয়েই জানে। আজকাল শরীরের জন্য মানুষের বড় লোভ—অমলেরও মাঝে মাঝে লোভ হয়।

কিন্তু কেয়াকে দেখলেই সব ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে যায়।

ওর শাড়ির পাড়, জুতোর স্ট্র্যাপ থেকে শুরু করে কাঁচের মত কপাল সবই যেন, শরীরবিরোধী একটা আলস্য। বলতে ইচ্ছে করে, 'কেয়া তুমি আমাকে আতুর, পরাজিত, কাপুরুষ করে দিচ্ছ দিনে দিনে। তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমি এখন সব ছেড়েছুড়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে বাঁচতে চাই। নিষ্কম্প মৃত্যুর ঔদ্ধত্য এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াক।'

বুকে সেই ট্রাকের ধাতব শব্দটা। মধ্যবিত্ত অমলের বুকেই কি শব্দ, গন্ধ, প্রতিবাদ এমন লুকিয়ে থাকে? বোঝা হয়ে ওঠে দিনে দিনে? অমল কি তার জন্মগত পাটাতন থেকে লাফ দিতে পারে না? জন্ম, প্রেম, বিবাহ, মৃত্যু সবকিছুই কী শুকনো খড়ের মত শুধু রোমাণ্টিসিজমের হাওয়াতে দুলেই তৃপ্ত? কোনো দুরন্ত অথচ জরুরী কাটা-ছেঁড়ার কাজ সে করতে পারবে না।

কিছুই বদলে যায় নি—কেয়া বলে, সবই আছে, আসলে তুমিই বদলে গেছ। কেয়ার কথায় বেশ একটা প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস। ওর অনেক মিথ্যে ধারণাকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় তখন।

তাই তো, এই যে বদলে গেলাম, কী হবে আমার? অমল কৌতুক করে।

আমি তোমাকে উল্টোদিকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আবার গোড়ায় ফিরিয়ে আনব।—কেয়ার আশ্বাস।

তা যে হবার নয় কেয়া।

কেন?

যেহেতু সবকিছু সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাকে তো আর ফেরানো যাবে না।

তুমি বেশী ভাব বলেই তোমার এত যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা শব্দটা এখন কেমন ন্যাকামো ন্যাকামো মনে হয়। যন্ত্রণা আবার কিসের? পৃথিবীতে আমরা কি অনিকেত, অসভ্য কিছু প্রাণী নাকি? তুমি, আমি, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, যন্ত্র, সাহিত্য, বেঁচে-থাকার কলা-কৌশল এতে বুঝি ভাববার কিছু নেই?

অমল হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। দপদপ করতে থাকে কপালের শিরা। একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে কেয়ার নিটোল মুখটাকে ফাটিয়ে

দিতে ইচ্ছে হয়। যাতে ওদের বাড়ীর উল্টোদিকের বুড়ি ভিখিরিটার মুখের সঙ্গে আর কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া না যায়।

একটা মানুষ নিজেকে বদলে নিতে কতক্ষণ সময় নেয়? ভেতর থেকে বদলাতে কয়েক যুগ কেটে যায় কিন্তু পোশাকে-আশাকে? কেয়ার দিকে তাকিয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল অমল। মাত্র একদিন আগে দিল্লীতে এসেছে কেয়া। এয়ার-ইণ্ডিয়ার অফিস ঘুরে আসতে না আসতেই আপাদমস্তক বদলে গেছে। চুলে লেগেছে রেশমের আভা, চোখে বিদেশ যাওয়ার তীব্র নেশা, পোশাকে আহ্বান ও নির্লজ্জতা, চলায় কৃত্রিম বিন্যাস।

আর একটা দিন থাকবে কেয়া। তারপর ভারতবর্ষের আকাশ ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে দূরে।

কেমন স্বপ্নের মত। তুমি চলে গেলে আমারও আর কিছু ভাল লাগবে না।—অমল কেয়ার দিকে তাকায়।

তোমাকে আমি রোজ চিঠি দেব। খবর দেব দেশ-বিদেশের। তোমার ভাল লাগবে না?—কেয়াও অমলের দিকে তাকিয়ে আছে।

কি ভাবছি জান? যাই হোক না কেন এক ধরনের একটা মুক্তি অন্তত তুমি পেলে। আমার হিংসে হচ্ছে।

হিংসে না ছাই, আমি চলে গেলে ভুলেই যাবে আমাকে—কেয়ার অভিমান।

ভুলে যাওয়ার একটা লিস্টি করছি আমি, তাতে অবশ্য তোমার নামটাই প্রথমে থাকবে।—অমলের কৌতুক।

থাকবেই তো! তোমাকে আমি চিনি না? তোমার নেশা তো নতুন নতুন—তারপর কেমন হাঁপিয়ে ওঠ তুমি।—কেয়া এবার সিরিয়াস।

আমি যে সত্যিকারের নতুন কিছু চাই—একদম বদলে যাওয়া একটা পরিবেশ, একটা মেয়ে, একদল মানুষ। যাদের পাশ দিয়ে গেলে ধান-গমের গন্ধ পাওয়া যাবে। চিমনির মত সাটান যাদের মাথা উঠে যাবে মেঘে। কিন্তু কি জান, সবাই সেই পুরোনো পৃথিবীটাকেই বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি কী নতুন হয়ে উঠিনি ? ছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, কপালে বোধ হয় একটা মাস্টারিই লেখা ছিল, অথচ দ্যাখো, কেমন আমি পৃথিবীর আধুনিকতম মেয়েদের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছি।

হো-হো করে হেসে উঠল অমল। হাসলে ওকে ভীষণ সরল দেখায়। একদম বাচ্চা বয়সের স্কুলের ছেলের মত। হাসি থামিয়ে ফস্ করে সিগারেট ধরায় অমল।

আধুনিকতম! বেশ বলেছ। আমি বললাম নতুন মানুষ আর তুমি বললে আধুনিকতম!—অমল কেয়ার মুখটা দু'হাতের তালুর মধ্যে তুলে নিয়ে হাসতে থাকে।

না কেয়া, আধুনিকতম না, আমি যা বলতে চাই সেটা অন্যকিছু।

কেয়ার শরীরে কাঁটা দিয়েছে। ঠোঁট দুটোয় রাজ্যের তৃষ্ণা। সে মনে মনে চাইছে অমল ওকে চুমু খাক। অমলের সমস্ত শক্তি ওর ঠোঁটের ওপর আছড়ে পড়ুক। আর তো একটা মাত্র দিন তারপর আবার কবে এমন কাছাকাছি বসা যাবে কে জানে! যে লোকটা এত ভাবে, এত গভীরে যেতে চায় তার কিন্তু কোনো আচরণেই দৃঢ়তা দেখে না কেয়া। মাঝে মাঝে তাই অমলের সমস্ত ব্যাপারটা হালকা মনে হয়। এই যে কেয়ার মুখটাকে ধরে আছে—তাতে না আছে জোর না আছে প্রবল বাসনা। কেয়ার চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। এর চাইতে নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে ? অপমানিত মনে হয় নিজেকে। তবু কিছুই করল না অমল। হাসতে হাসতে হাত দুটো সরিয়ে আনল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছল।

কেয়ার প্রচণ্ড আশাভঙ্গ সবকিছুকে নিভিয়ে দিল যেন। অমলের দিকে ভাল করে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। অথচ বুকের ভিতর অমলের জন্য আবার আকুতিও অনুভব করছে। অমলের যেন কিছুই হয় নি। শুধু কেয়ার মুখটাকে আলতো হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন দরকার ছিল না। দরকারটা ফুরিয়ে যেতে আবার কথা শুরু স্বাভাবিক গলায়। কথা তো নয় যেন জটপাকানো হাজার সব ভাবনা ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কেয়া অন্য-

মনস্ক, পাশে বসে শুনে যাচ্ছে আর ভাবছে অমলকে ছেড়ে কত দূরে সে চলে যাবে।

রাত্রে সমস্ত এয়ার হস্টেস ও অন্যান্য কিছু অফিসিয়ালদের একটা পার্টি ছিল এয়ার হস্টেলে। যারা নতুন কাজে যোগ দিয়েছে বিশেষ করে তাদের জন্যই ব্যবস্থাটা। পার্টির শুরুতে ছোট একটা বক্তৃতা ছিল। সাধারণ উপদেশ ও কাজের গুরুত্ব সম্পার্কিত। বক্তৃতায় হালকা দিকও ছিল—সেকস্-বিষয়ক রসিকতা। যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি বয়স্ক। তবে খুব স্মার্ট। কেয়ার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি অবাঙালী মেয়ে—কিছুদিন আগে চাকরিতে এসেছেন। বক্তৃতার শেষে খাওয়া-দাওয়া এবং আলাপচারিতা। আঁটো-সাঁটো ছকটা তখন আলগা!

পাশের মহিলাটি হুইস্কি অফার করলেন কেয়াকে। কেয়া গুটিয়ে গেল। আমি তো খাই না।

কেন? জান অফার যদি না নাও তাহলে আমাকে অপমান করা হয়।

অন্যপাশ থেকে একজন তরুণ সুবেশ পাইলট এগিয়ে এসে ওদের মাঝে পড়ল। খাও মিস, কিছু হবে না। বিদেশের অনেক জায়গায় এটা ছাড়া উপায় থাকবে না। তোমরা বাঙালী-মেয়েরা বড় শাই।

পাশের মহিলা কেয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এখনো গ্লাসে মুখ ঠেকায়নি। কেয়া দিশেহারা হয়ে গেল।

কী যে করবে বুঝে উঠতে পারল না। এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটবে কেয়ার অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ব্যাপারটা ঘাড়ে এসে পড়বে ও ভাবেনি। এখন অমল থাকলে সব হয়ত সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু এ-রাজ্যে অমলের প্রবেশ নিষিদ্ধ!

নিন ধরুন।—পাইলট ভদ্রলোক জোর করে কেয়ার হাতে গ্লাসটা তুলে দিল।—আসুন আপনাকে আমি সাহায্য করি—ভদ্রলোক কেয়ার হাতের ওপর হাতটা রেখে গ্লাসটা চেপে ধরল তারপর মুখের কাছে তুলে দিয়ে বলল, চিয়ার্স।

কেয়ার মনে হল খানিকটা আগুন যেন গড়িয়ে পেটের মধ্যে নেমে গেল। মুখ থেকে গ্লাস নামিয়ে দু-চারটে কাজু-বাদাম তুলে নিল কেয়া।

কী? খারাপ লাগছে? পাশের মহিলাটি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

গত রাত্রের পার্টির গল্পটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল অমল। মনে মনে হাসল, তারপর কেয়াকে জিজ্ঞেস করল, এবার তুমি সুখী তো কেয়া?

কথাটা ভাল লাগল না কেয়ার। অমল যেন আঘাত করছে ওকে। তবু গায়ে মাখে না। জান অমল, মানুষগুলো খুব সরল। তেমন কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। খালি হৈ-হৈ, হাসি-ঠাট্টা।

তাই নাকি!—অমল অবাক হবার ভান করে।

একজন বলল, তোমরা বাঙালীরা তো খুব কবিতা লেখ শুনেছি, তুমিও লেখ না কি? যা হোক একটা শোনাও আমাদের।

শোনালে তো? অমলের প্রশ্ন।

ওটা কি কবিতা শোনাবার জায়গা নাকি? তাছাড়া মনেই পড়ল না আমার। বলে দিলাম, এখন আর আমরা কবিতা লিখি না—সবাই আপনাদের মতই হয়ে যাচ্ছি।

কথাটা ঝুলে থাকা লাশের শেষ চিঠির মত মারাত্মক মনে হল অমলের। এভাবেই কেয়া ভুলতে ভুলতে হয়ত বাংলা ভাষাটাই একদিন ভুলে যাবে। একটা ভণ্ডামীর ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে থাকতে মনে হবে চমৎকার এ্যারেঞ্জম্যাণ্ট। অমলের ইচ্ছে হল একবার ছুঁয়ে দেখে কেয়াকে। বুকের ভিতর ট্রাকের শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে—শব্দটা যেন গর্জন করছে। সেই বিপুল গর্জনের মধ্যেই অমল জিজ্ঞেস করল, 'এবার তুমি সুখী কেয়া?'

'...........'

কেয়া কী বলল শুনতে পেল না। কানেকশানটা রং নম্বরে গিয়ে খালি যেন এনগেজ সাউণ্ড দিচ্ছে। একটা ক্রস-কানেকশনের গলা এসে বলল, 'প্রয়োজন হল নিশ্ছিদ্র একটা ব্যবস্থা, এক

মিনিট আগেও যেন না জানতে পারে, প্রত্যেককে চোখে চোখে রাখ —দ্‌তাবাস—' শেষ হবার আগেই ট্রাকগ্‌লো যেন এসে পড়ল। অমলকে পিষে দিয়ে একের পর এক, একের পর এক মাপা দ্‌রত্ব রেখে এগোতে থাকল···খালি এগোতে থাকল···।

খুব সাংকেতিক নয়

জানলায় লোহার পোক্ত জাল। বটগাছটা জানলা ঠেলে উঠেছে, জায়গাটা তাই অন্ধকার মত। এটা কোনো নালিশের ব্যাপার না বরং সমস্ত আবহাওয়ায় যেন রিলিফ। লিপিকা অনেকবার গাছটার দিকে তাকায়। হাসপাতালের একঘেয়ে দিন। সকালে দু পিস্ পাউরুটি, এক খাবলা চিনি, একটা কলা অথবা সপ্তাহের বরাদ্দ দুটি ডিমের একটি। তারপর দুধ নামক তরল। দুপুরে ট্রে ঠেলে ভাত। বিকেলে কিছু নেই। রাতে আবার ভাত। বিকেলে ভিজিটার ফল-পাকুড় সন্দেশ নিয়ে আসে। রোববার যেন মেলা বসে ভিজিটিং আওয়ার্স-এ। ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। রুগীদের কমন বাথরুম দুটি অসহনীয়। মেথরকে আলাদা করে পয়সা না দিলে ঢোকা যায় না। অসহ্য ঝাঁঝালো গন্ধে ঘুম হয় না রাত্রে।

লিপিকার স্বামী কারিগর। স্বামীর স্কুটার নেই, হেলমেট নেই, গ্লাভস নেই। ওকে কেমন দেখাবে স্কুটারে চাপলে? হেক্কর-বাজ? অসীম নিজের চাকরী ছাড়া কিছুই বোঝে বলে মনে হয় না—আপাতদৃষ্টিতে। নেশা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান।

হাসপাতালের টানা বারান্দায় বসে ছিল অসীম। আগামীকাল লিপিকার অপারেসন। ৩১৮ টাকা লেগেছে প্রেসক্রূপসন মোতাবেক ওষুধ কিনতে। রক্ত কিনতে হয়েছে কালো বাজারে। চার বোতল ৪00 টাকা। কালো বাজারে রক্ত কেনার ব্যাপারটা যত গোলমেলে মনে হয়েছিল শুরুতে পরে কিন্তু অতটা ছিল না। অসীম কার-খানায় দু একজনকে বলেছিল রক্ত জোগাড়ের ব্যাপারটা। ডোনার চাই। কিন্তু ডোনার পাওয়া যে খুব সোজা হবে না অসীম তা সাধারণ বুদ্ধিতেই টের পেয়েছিল। এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কি করা যায় ভেবে। ভিজিটিং আওয়ার্সে এ-ব্যাপারে কথাবার্তা বলল অসীম আর লিপিকা। কিন্তু কোনো কিনারা পাওয়া গেল না। ভিজিটিং আওয়ার্সের পরে লিপিকা সমস্যাটা নিয়ে আশে-পাশের রুগীদের সঙ্গে যখন আলাপ করছিল, ওয়ার্ডের জনৈকা আয়া

এগিয়ে আসে এবং ভরসা দেয়। 'রক্তের জন্যে ভাববেন না, জোগাড় হয়ে যাবে। তবে দাম একটু বেশী দিতে হবে। বোতল পেছু একশো।'

'জোগাড় হবে ? ঠিক বলছ তো ? বলব ওকে ?'

'বলবেন বৈকি। আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন, সব বলে দেব। ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে রাখবেন কখন লাগবে। সেদিনই জমা পড়ে যাবে।' যথারীতি দেখা-শোনা হল। কথাবার্তা হল। রক্ত বেচার লোক থাকে। ফাঁড়া কেটে গেল অসীমের, যেন কোনো সমস্যাই নয় রক্ত জোগাড়।

অসীমের পায়ের তলা দিয়ে ধেড়ে একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল। পা সরিয়ে আনল অসীম। ঘড়ি দেখল। প্রায় দশটা বাজে। অনেকটা রাত হয়েছে। আরো কিছুক্ষণ বসবে কিনা ভাবছে। ফাঁকা করিডরটা মন্দ লাগছে না। লোকজনের চলাচল কম। অসীমের দিকে কারো কোনো ঔৎসুক্য নেই। একবার শুধু চলমান একজন দেশলাই চেয়েছিল বিড়ি ধরাতে।

অসীমের বুক পকেটে মারাত্মক একটা চিঠি রয়েছে। খুবই ব্যক্তিগত চিঠি। কারখানাতে রেখে এলেই ভাল ছিল। এ চিঠি কাউকে দেখানো চলবে না। চিঠিটা দুবার পড়েছে, আরো অনেকবার পড়তে ইচ্ছে করছে। ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে ভাবছে কিন্তু চিঠিটা একবারও পড়ল না। এখন লিপিকার অপারেশন নিয়ে খুঁটিনাটি ভাবতে হচ্ছে। আরো কত টাকা জোগাড় করতে হবে, অপারেশনের পর কোনো বিপদ হতে পারে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা রকম ছক তৈরী করছে মনে মনে। লিপিকার শরীরে কোনো খুঁত চোখে পড়ে না—এমন শরীরকেই প্রাকৃত ভাষায় গতর বলে। মনে ধরার মত। অসীমের জগত অস্বাভাবিক ছোট, লিপিকা সেখানে বেশ বসে গিয়েছে। দুজনের মধ্যে ভালবাসার মত মধ্যবিত্ত সংস্কার না থাকলেও, স্বস্তি রয়েছে।

লিপিকা স্বামীকে নিয়ে মজাতেই থাকে। রুমাল, আন্ডারওয়্যার,

গেঞ্জি—কাচাকাচি করে। মাঝে মধ্যে সিনেমা, মোগলাই পরোটা—বেশ তৈরী জীবন।

কমলালেবু টালে থাকলে বুনো গন্ধ ছাড়ে। লিপিকা মাথার কাছে রাখা গ্লুকোজের প্যাকেট-আর বিচ্ছিন্ন লেবু দুটোকে দেখছিল। কথায় বলে কমলা রঙ। হাসপাতালের আলোয় রঙ অদ্ভুত মাত্রা পেয়েছে। রাত দশটা। এত বড় ঘরে একটি মাত্র বাল্‌ব জ্বলছে। রুগীদের কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ কাতরাচ্ছে। মানুষ যে কত রকম শব্দ করতে পারে! সবকিছু ভৌতিক মনে হয়। ওর পায়ের দিকে ১২ নম্বর বেড কালো পর্দায় ঢেকে দিয়ে গেছে। এতে অবশ্য কেউই কিছু অসুবিধে বোধ করছে না।

রাত্রের খাবার এসেছিল যেমন আসে—সন্ধ্যে ৭টায়। ১২ নম্বর বেডের খাবার ৮ নম্বর চেয়ে নিয়েছিল। হাসপাতালে যা দেয় তাতে পেট ভরে না অনেকেরই। ১২ নম্বর মরে কাঠ হয়ে আছে। হয়ত পিঁপড়ে ঘুরছে। তাতে কি? খাবার-ট্রলি ঘুরে ঘুরে খাবার দিয়েছে সবাইকে। ১২ নম্বরের আশেপাশেও। সবাই খেয়েছে যতটুকু খাবার। ৮ নম্বর আজ বেশ খুশী। পরিতৃপ্ত। ১২ নম্বরের ট্রেটা সে পেয়েছে।

'দিদি আজ পান খেতে পারলে হত—জর্দা পান। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় পান খেলে, বলুন? ডাক্তারদের আবার বেশী-বেশী। এদিকে তো আধপেটা খাইয়ে মারছিস।'

'আজ আধপেটা বলতে পারবেন না।' পাশ থেকে কথার পিঠে কথা এল।

কে জানে ৮ নম্বরের কি অসুখ। লিপিকা চুপচাপ। শুধু শুনছে।

সে দিনটি টেপ্‌-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার দিন ছিল। যন্ত্রটি ইনস্টলমেণ্টে কেনা।

'আজ কিন্তু কিছুই শুনব না। তোমার ব্যবহার বুঝতে পারছি না আমি।' লিপিকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেও আক্রমণাত্মক।

'আমার ভালো লাগে না'

'তোমার ভালো লাগতেই হবে। আজ আমার চাই।'

'শরীর ভালো নেই আমার। তাছাড়া ব্যাপারটা তো জোর-জবরদস্তির নয়—ফিজিক্যাল ইউনিয়ানে—শরীরের ক্ষুধার্ত আগ্রহ-টাই আসল। আমি তা পাচ্ছি না লিপিকা।

'খিদে হবে—আমার হাতে ছেড়ে দাও। বুড়ো গোয়ালাটা অব্দি আমায় দেখলে—'

'বাজে বোকো না'

'আজ আমি কিচ্ছু শুনব না'

'দেবব্রত বিশ্বাস শোনো'

'কথা ঘুরিও না—আজ চাই-ই'

হাসপাতালে এত শুয়োর থাকে? মেলা শুয়োর চরে বেড়াচ্ছিল। কি জানি লিপিকা দেখতে পাচ্ছে কিনা। শুয়োরছানাই বেশী। লিপিকা বসে বসে সামান্য হাঁপাচ্ছিল। ও সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে যেন আরাম পাচ্ছে। নিচের দিকে তাকালেই কষ্ট। শুতে পারলে বাঁচা যায়। এরই ফাঁকে লিপিকা শুয়োরগুলোকে দেখতে পেয়েছে কিনা অসীম ভাবল। মরুক গে। শুয়োর কোনো ব্যাপার না এই মুহূর্তে। দু পাশে, সামনে-পেছনে, আরো অনেকে বসে আছে। ডাক্তারবাবুর ডাকের অপেক্ষা।

চশমার তলায় মাছি-গোঁফ থাকলে হিটলার বলে ভুল হতে পারত ডাক্তার দাশগুপ্তকে। ওঁর সামনাসামনি হয়ে অসীমের এটাই প্রথম প্রতিক্রিয়া। লিপিকার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই—সে মা হতে চলেছে—ডাক্তার তাকে পার করবে—হাতে বাচ্চা তুলে দেবে। কিছুটা আবেদন, কিছুটা ভরসা-ভিক্ষা ওর চোখ দুটোয়—হয়ত বা।

'কিডনিটা একটু ডিসপ্লেসড মনে হচ্ছে। আনন্যাচারাল। তাতে অবশ্য ডেলিভারির অসুবিধে হবে না। তবে এবডোমেন ওপেন করতে হতে পারে—বয়সের ব্যাপারটা রয়েছে কিনা। আজকাল রুটিন ব্যাপার। রক্তচাপের দিকটা আসল।'

'ভয়ের কিছু নেই তো ডাক্তারবাবু? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি তো কারখানায় কাজ করেন, তাই না?'

'এসিস্টেণ্ট ফোরম্যান'

'আপনাদের প্রোডাক্ট?'

'ক্যাপ তৈরী করি আমরা'

'ক্যাপ? ফ্রেঞ্চ্-ক্যাপ?'

'না, না, বাল্‌বের মাথায় যে মেটালিক কাভার থাকে, সেটা। ও জিনিষ আবার দুরকম হয়। পিন টাইপ আর স্ক্রু টাইপ।

'ব্যাপারটা আপনি জানেন—আমি আনাড়ি। তাই না? মেটাবলিজম্ কিংবা রিপ্রোডাক্‌সনের অন্ধি-সন্ধি এক মিনিটে কি বোঝানো যায়? বলুন? আমাদের ওপর ছেড়ে দিন ওটা। শুক্রবার চলে আসুন—যা দরকার করা হবে।' তারপর লিপিকার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'ওষুধ লিখে দিচ্ছি, কিছু ভয় নেই, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

সেই চিঠিটা পকেটে রয়েছে। ঝুমার চিঠি। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

'ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম যখন বললেন, একটা কথা বলব?'—ঝুমা বলেছিল।

এ-দৃশ্য এলাহাবাদে খুসরুবাগের সমাধি-স্থলে। কত বয়স তখন অসীমের? ২৬।২৭।

'বেশ গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে কথাটা বললেন'

'অথচ কথাটা কিছুই না'—অসীম বলেছিল।

'কথাটা অনেক কিছুই হতে পারত। কিন্তু আপনি বললেন,

বৃষ্টি হতে পারে, বিশ্রী মেঘ হয়েছে। চল ফিরি এবার'

'তুমি কিছুতেই আমাকে তুমি বলবে না, না?'

'আপনাকে তুমি বলতে ভাল লাগে না। কেমন যেন অমর্যাদাকর।'

'আমাদের সম্পর্কটা তাহলে মর্যাদার? আর কিছু না?'

'আমাদের সম্পর্কটা অনেক কিছুর। বাঁচা-মরার। টরে-টক্কা'।

'টরে-টক্কা?'

'হ্যাঁ, টরে-টক্কা'

'মানে?'

'জীবনে যত পুজা—ওই আর কি—সাংকেতিক'

অপারেশন থিয়েটার কেমন অসীম দেখে নি। কাঁচের দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। শেষ অবধি সিজার হচ্ছে। ডাক্তারি ভাষায় ইনিস্ট্রুমেন্টাল ইন্টারফিয়ারেন্স। বাচ্চাটা ওভাবে দুনিয়া দেখবে। হা ঈশ্বর, তবু দেখুক। হাউস-সার্জেন বলেছে, আরো রক্ত লাগতে পারে—ডোনার রাখবেন। কোথায় ডোনার খুঁজবে অসীম। বাচ্চা হবার জন্যে কেউ রক্ত দেয় না। অবধারিত খারাপ কেস হলে কেউ কেউ রক্ত দিতে এগোয়—তাতে হাততালির মজা রয়েছে। ও-টাও বেশ একটা মাস্তানি। ডেলিভারি কেস্—ধুস্।

আমি কেমন আছি ভেবেছেন কখনো? স্বামী ছেলে, দেওর, ফ্ল্যাট (মোটেই বড় না), সামনে ন্যাড়া পাহাড়—কি নেই আমার! তবু রোগা হয়েছি বছর বছর। মানে পাঁচ বছর। বিয়ের পরের দিন শ্বশুরবাড়ি যেতে বিশ্রী অসভ্যের মত কেঁদেছিলাম। তারপর থেকে একটাও চিঠি দিই নি আপনাকে। আপনিও না। জানি না, আপনি কেমন আছেন। আপনার সংসার কেমন। সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম—আপনি আমার থাকবেন তো? যাক। আসল কথায় আসছি। আমি আত্মহত্যার ডিসিশন নিয়ে এই চিঠি লিখছি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। এরকম স্বাধীন মৃত্যুই আমাকে

নিয়তির হাত থেকে মুক্তি দেবে। কেন আমি নিয়তির বাধ্য থাকব ? অন্যেরা যেমন রাখে, আমি বালিশের তলায়-টলায় কোনো জবানবন্দী রাখছি না। আপনি চিঠি পেয়ে কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হল না। জীবনের এইখান-টাতেই আমার একটু দুঃখ থাকল। আত্মহত্যার পর বড় টানা-হ্যাঁচড়া হয়—এটুকু ভাবতে গা ঘিনঘিন করছে। ইতি ঝুমা।

ও-টির সামনে দম চেপে বসে রয়েছে অসীম। ভেতরে অপারেশন চলছে। বাইরে বসে কিছুই জানার উপায় নেই। যে কোনো মুহূর্তে নার্স বেরিয়ে এসে রক্ত চাইতে পারে। নয়তো অন্য কিছু। কিছু বলতেও পারে। ওর ডোনার নেই। নিজের ডোনার নিজে হবে ভেবে রেখেছে। কোনো বিপদ হবে না তো লিপিকার ? না, না, বিপদ হবে কেন ? এই অপারেশনে তেমন ভয় থাকে না।

বুক-পকেটে হাত চলে যায় অন্যমনস্ক। ওখানে ঝুমার চিঠি। এত কিছু ভাবতে পারছে না অসীম। টেনসানে ওর ঝিমুনি আসছে। খুব ঘুম পাচ্ছে।

ভিন্ন বয়স

এক এক দিন বৃষ্টি থামলে রোদের রঙ এত কোমল আর ঘন মনে হয়, যেন, খানিকটা তার আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনা যাবে। পশ্চিমের এই এক ধরণ। বৃষ্টি কম বলেই বোধ হয় এরকম।

হাঁটু ভাজ করে পায়ের ওপর পা তুলে কেয়া শুয়েছিল। আজ-কাল কোনো কোনো দিন দুপুরে ঘুম পেয়ে যায়। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে—দু মাসের মত টানা ছুটি।

আগে টানা ছুটির দুপুরগুলো কেয়াকে খুশি করত। কিন্তু এবার করছে না। কি রকম একঘেয়ে। কেন হল ? কোনো জবাব সে খুঁজে পায় না। ভালো লাগার দিন চলে যায়, নাকি নতুন আর কোনো ভাল লাগা শুরু হবে বলে এই একঘেয়ে ভবিতব্য ? কেয়া ভাবছে—সুসংবদ্ধ ভাবনা নয়—এলোমেলো। জানলা পেরিয়ে রাস্তায় চোখ চলে গেল মন তখন অন্যরকম। রাস্তায় লোকজন, গাড়ি যায়। তবে খুব যে মন লাগে, তা নয়—লেগেও লাগে না। আগে আগে কেয়া একটি মজার খেলা খেলত। রাস্তায় যত গাড়ি যাবে তাদের নেম-প্লেটের শেষ সংখ্যা দুটো জোড় না বিজোড়—মনে মনে তা নিয়ে বাজী। কিন্তু এবার তা-ও ভালো লাগছে না। দুপুরগুলো কি অসম্ভব বড় হয়ে গেছে—এ-ঘর ও-ঘর লক্ষ বার হাঁটলেও সময় কাটে না। কখনো কখনো মনে হয় দুপুর বড় স্থির—অনড়। দুপুরটা তবু যা-হোক, একরকম। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতে ? হঠাৎ সব কিছু যেন মরে যায়। দম-আটকানো শুনশান। মা থাকে রান্না ঘরে। রুটি বেলছে, তাওয়ায় দিচ্ছে। নয়তো ডালে সম্বার। সম্বারের শব্দে জানান দেয় প্রাণের অস্তিত্ব।

এ সময় গল্পের বইয়ের অক্ষরগুলোও জট পাকিয়ে থাকে। পড়া যায় না। জট খোলে না। কেয়া হতাশ হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ যদি মা ঘরে এসে পড়ে তাহলে যেন স্বস্তি। মাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর খেতে পারলে হয়ত ভাল লাগবে। কিন্তু কেয়া

পারে না। তা-ও শেষ হয়ে গেছে—লজ্জা হয়। কেয়া এখন বড় হয়ে উঠেছে।

বড় হওয়ার কথায় মনে পড়ল কে যেন একবার স্কুলের বাথরুমে লিখে রেখেছিল, 'আমি তাকে ভালবাসি'। কোন নাম ছিল না। কেয়া পংক্তিটা বার বার পড়েছিল। কে কাকে ভালবাসে? আর ভালবাসার কথাটা এই বাথরুমেই বা লেখা হল কেন?

কেয়া ক্লাসে এসে ডেস্কে অনেকবার নখ দিয়ে পংক্তিটি লিখে-ছিল। নখের কোনো দাগ পড়েনা কাঠে। তারপর স্কুল ছুটি হতে বাড়ী ফিরেছিল কথাটা ভাবতে ভাবতে। রাতে পড়ার বই খুলে চুপচাপ অনেকক্ষণ ভেবেছিল এমনভাবে কে কাকে লিখতে পারে। অনিতা, শুভ্রা, মায়া, সাহানা—এদের কী কেউ? গোল হয়ে বসে এরাই তো নীল মলাটের চটি বই এনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। দুপুর ছুটিটা কখন যে কেটে যায়! কেয়াও একদিন ওরকম একটা বই পড়েছিল। নতুন নতুন অজানা সব গা শিরশির করা কথা। প্রত্যেকটা পংক্তি শরীরের রোমকূপ ফুঁড়ে ভেতরে বসে যায়। একদিন তো শুভ্রা একটা কাণ্ডই করেছিল! বই পড়ার মাঝখানে হঠাৎ কেয়ার স্কার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে গাল কামড়ে দিয়েছিল। কেয়া যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠেছিল। শুভ্রাটা চিরকালের অসভ্য।

বাবা বলেন, ভাল ভাল বই পড়বি। কেয়া ভাল বই কাকে বলে বুঝে উঠতে পারে না। রামায়ণ মহাভারত না কি? মা-বাবার কথাগুলোই অমনি। বড্ড বেশী বুড়োমী করে কেয়ার সঙ্গে। অথচ কেয়ার তো আর জানতে কিছু বাকী নেই। ওই নীল চটি বইয়ের চাইতে ওঁদের স্বভাব-চরিত্র কি ভিন্ন? একদিন দুপুরে যদি না দেখে ফেলত কেয়া। তারপর থেকে ওদের বুড়োমি আর শাসন দেখলে ওর হাসি পায়।

মা এখনো বুড়িয়ে যায় নি। মাকে তাই ভাল লাগে। বাবার জুলফিতে পাকা চুল। কপালটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। বাবাকে দেখলে মনে হয়, বাবা বুঝি বেশীদিন বাঁচবেন না।

চিরকালই বাবার রাত করে ফেরা অভ্যেস। মাঝে মাঝে আবার নেশা করে ফেরেন। তখন চোখ দুটো চকচক করে। তেলতেলে

কপালে আলো পড়লে কাচের মত মনে হয়।

কোনো কোনো দিন বাবার কী যেন হয়ে যায়। কেয়াকে খুব আদর করেন। বলেন, তোকে আমি বিলেত পাঠাব—খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার করব। দেখবি লোকে আমাদের কত হিংসে করবে। খবরদার কোন বাজে ছেলের সঙ্গে একদম মিশবি না। তারপর হয়ত মাকে চেঁচিয়ে ডাকবেন, শীলা, শীলা। গমগম করবে ঘরটা। তখনো জুতো, টাই, কিছু খোলা হয়নি। জুতোর খট্-খট্ শব্দে জেগে উঠবে বাড়ীটা। কেয়া জড়োসড়ো সরে গিয়ে কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে—বড় বড় চোখ দুটোয় ভয়, বিস্ময়, বিহ্বলতা।

মা ছুটে আসে, বলে, আচ্ছা, বুড়ো বয়সেও কী তোমার আক্কেল হবে না। এমন দুপুর রাত্তিরে কেউ চেঁচায়।

চেঁচালাম না কি!

তারপর ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলবেন, এই চুপ করলাম।

মা পাজামা এগিয়ে দেয়। কেয়াকে দেখতে পেয়ে বলে, যা না, ঘুমোতে যা না। কি চেহারা হচ্ছে দিনকে দিন, একবার আয়নায় দেখিস তো? কেয়া সরে যায়। বাবা বকবক্ করতে করতে জামা-কাপড় ছাড়েন, বাথরুমে যান। কোনোদিন খান কোনোদিন খান না, চুপচাপ শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

কেয়া এক এক দিন মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, আমাদের দেশ কোথায়? দেশ মানে? অবাক হয়ে যায় মা। মেয়েটার অদ্ভুত সব প্রশ্ন!

প্রশ্নটা অবশ্য অসঙ্গত কিছু না। এলাহাবাদ যে ওদের দেশ না, কথাটা সত্যি। এখানে প্রবাসীর মত দিন কাটানো। কেয়াও জানে ওদের দেশটা দূরে কলকাতার কাছে কোথাও যেখানে বর্ষায় খুব বৃষ্টি হয়, এলাহাবাদের মত এমন ধুলো হয় না, মেয়েদের মুখশ্রী আরো ঢলোঢলো, কোমল। কেয়া ভাবে, যেভাবেই হোক, একদিন সে দেশে যাবেই।

বাবা বলেন দেশ নেই আমাদের, যেখানে রোজগার সেইটেই দেশ, যেখানে সম্মান প্রতিপত্তি সেইটেই আমাদের জন্মভূমি।

এসব কথা কেয়ার বিশ্বাস হয় না। বাবার কথায় কোথায় যেন

একটা অভিমান রয়েছে। কেয়া বন্ধুদের বলে, পাশ করে সে কলকাতায় ভর্তি হবে। এলাহাবাদে একটুও ভাল লাগে না।

দূরে তাকালে স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যায়। মালগাড়ির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া ওঠে থোকা থোকা, মাজা আকাশে লেপটে যায় কালি। কেয়া শুনেছে এমন কালো মেঘ হয় কলকাতায়। এলাহাবাদে মেঘ বড় কম। বৃষ্টি নেই বললেই চলে।

বাবা হাসেন, বলেন, দেখ মা, মেঘ চাই না, টাকা চাই। কিন্তু কেয়া ভাবে মেঘ না হলে ধান গম কিছুই তো হবে না। বইয়ে পড়েছে ধান-গম না হলে দুর্ভিক্ষ।

কেয়ার বুকের ভিতর টনটন্ করে—সে ভাবে দুর্ভিক্ষ মানে বড় অসময়। কেয়া কখনো ধানের ক্ষেত দেখেনি, নিশ্চয় দারুণ কিছু ব্যাপার। অনেকটা স্বপ্নের মত।

আচ্ছা, বাবা কী ওর মত স্বপ্ন দেখেন না? বয়স বাড়লে কী মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়?

ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটু এগোলে একটা ছেলে ফাউন্টেন-পেন সাজিয়ে বসে থেকে। লাল, নীল, হলুদ কত রঙের সব কলম। যেন নানা রঙের পাখির পালক। ছেলেটার দিকে তাকালে কেয়ার মায়া হয়। ঠিক মায়া না কেমন একটা যন্ত্রণা। কাজটা যেন ওকে মানায় না। কত ওর বয়স হবে?—বাইশ কি তেইশ। এই বয়সে ও কেন পথের পাশে ফেরী করবে? ও এখন লাল রেসিং কারের ষ্টিয়ারীং-এ হাত রেখে একশ মাইল স্পীডে উধাও হয়ে গেলে তবেই যেন কেয়ার স্বস্তি। কেয়া দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। চোখের ওপর তির তির করে মিটারের কাঁটা।

দুপুরগুলো যখন কাটতে চায়না তখন মার সঙ্গে ঝগড়া করতে কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলঘরের জলে বসে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কলঘরের কথা মনে উঠতেই গা-টা শিরশির করে উঠল।

একদিন সে ওই কলঘরে বিশ্রী একটা বিছে দেখেছিল। সে কি ভয়! প্রথমে কি করবে বুঝে উঠতে পারেনি—শরীরটা পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর দরজাটা খুলে লাফ মেরে বেরিয়ে এসেছিল।

বেরিয়ে এসে সে কি লজ্জা—গায়ে একটুও সুতো ছিল না। দুহাতে বুক দুটো চেপে দৌড়ে শোবার ঘরে চলে এসেছিল। টান মেরে বেড-কভারটা জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে। চুলে, চিবুকে চিকচিক করছিল জল।

দৌড়ে মার কাছে চলে এসেছিল। ওকে দেখে মা তো থ'। রান্না ছেড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে, কী হল তোর?

কলঘরে একটা বিছে মা! বলেই জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। থর থর করে ওর শরীরটা তখন কাঁপছে। মা একটু হেসে বলেছিল, দূর পাগল, পুরোনো বাড়ীতে ওরকম দু একটা বিছে থাকে। চল তো দেখি।

মা এসে বিছেটা দেখেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আবিষ্কার করতে পারেনি কলঘরের কোথাও। কলঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, থাক গে, তুমি বেরিয়ে এস মা। কেয়ার মনে হচ্ছিল, মা খুঁজে না পেলেও বিছেটা ঠিক মাকে লুকিয়ে দেখছে। সুযোগ পেলেই কামড়ে দেবে। তখন? কেয়া আর ভাবতে পারেনা।

কেয়ার ধারণা, কামড়ে দিলে যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। মরেও যেতে পারে মা। এই নির্জন দুপুরে ওই বাথরুমে মা যদি মরে যায়—কেয়া তখন কী করবে? মরে যাওয়াটা যে কি ব্যাপার কেয়া ঠিক ঠিক জানে না, তবে এইটুকু জানে মরে গেলে তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ওর মাকেও তখন পুড়িয়ে ফেলা হবে।

কেয়ার বুক ঠেলে কান্নার দলা যেন গলায় উঠে আসছে। বিকৃত গলায় কেয়া চিৎকার করেছিল, মা, বেরিয়ে এস, এক্ষুণি বেরিয়ে এস।

মা অবাক হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি ফেলে বেরিয়ে আসে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এত ভয় তোর? বিছেতে কামড়ালে কি হয় রে? কেয়া কোন কথা শুনতে চায় না। আচমকা মাকে জড়িয়ে ধরে মুখটা বুকে গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মা-তো অথৈ জলে! কী থেকে কি! যা এখন বেডকভার ছেড়ে জামা কাপড় পরগে।

কেয়ার যেন হুঁশ হয়। মাকে ছেড়ে দৌড়ে ঘরে চলে যায়। সায়াটা টেনে নেয় হাতে—তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।

গেরুয়া বেডকভারে চেহারাটা দেখাচ্ছে যেন যমুনা-ঘাটে সন্ন্যাসিনীর মত।

স্কুলের শেষ পরীক্ষার পর সব কেমন বদলে যাচ্ছে। স্কার্ট আর জামা পরতে এখন আর ভাল লাগে না। লজ্জা করে।

দুপুরে মাঝে মাঝে রোদ এসে গায়ে পড়ে। তা-ও এমন জায়গায় পড়ে কেউ যদি দেখে, ভাববে, মেয়েটা কি নির্লজ্জ। অথচ রোদ থেকে যে শরীরটা সরিয়ে আনবে তাও ইচ্ছে করে না। বালিশ থেকে মাথা তুলে কখনো নিজেই দেখে। রোদে শরীর যখন গরম হয়ে যায় তখন সরে আসে, পাশ ফিরে শোয়!

পাশ ফিরে শুলে তক্ষুনি ঘুম আসে না। উল্টোদিকের অন্য বাড়ীর জানলা দেখা যায়। সোজাসুজি। এক বছর আগে ও-বাড়ীর ছবিদির বিয়ে হয়েছে।

ছবিদিকে লেখা ছবিদির বরের চিঠি চুরি করেছিল কেয়া আর ওর বন্ধুরা মিলে। বিয়ের কদিন পরে ছবিদি তখন বাপের বাড়ী এসেছে। চমৎকার লিখেছিল চিঠিটা। ছবিদির বর ছবিদির নামটা অবধি পালটে দিয়েছিল। চন্দন। কেয়ার হাসি পেয়েছিল। চন্দন আবার মেয়েদের নাম হয় নাকি? চিঠির শেষটা ছিল খুব মজার। চুমু-চুমু-চুমু। লোকটা কি অসভ্য রে বাবা।

চিঠি চুরির জন্য কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল ওরা। বন্ধুদের কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! ছবিদি খুব ধমকেছিল, বরকেও বলে দিয়েছিল। ভদ্রলোক একদিন কেয়াকে একা পেয়ে বলেছিলেন, আমাকে বললেই পারতে, তোমাকেও না হয় খুব ভাল একটা চিঠি লিখতাম। চিঠি লিখতে খুব ভাল লাগে আমার।

দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল কেয়া। দৌড়তে দৌড়তে খালি মনে পড়েছিল, চুমু-চুমু-চুমু।

কেয়াদের দোতলায় অন্য ভাড়াটে। ওরা খৃস্টান। ওদের বাবা

রেলে চাকরী করে। কুকুর পোষে। ছেলেরা শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করে। ডিসেম্বর মাসে ঘর সাজায়, কেক আনা হয়। খুব খাওয়া-দাওয়া হৈ-চৈ। কেয়া ওদের পাত্তা দেয় না। ওরাও।

তবু নির্লজ্জের মত ওদের বড় ছেলে একদিন কেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, পাশ করলে কোন কলেজে পড়বে?

কেয়া ভ্রূ কুঁচকে একটুখানি দাঁড়িয়েছিল, তারপর বলেছিল, জানিনা, বাবা যেমন বলবেন!

তবু তোমার একটা ইচ্ছে আছে তো।

তেমন কিছু ভাবিনি। আগে পাশ করি তো।

ফেল করলে আর ভর্তি হবে কোত্থেকে।

কেয়া অপমানিত বোধ করেছিল কথাটা শুনে। আর দাঁড়ায় নি। যেতে যেতে শুধু বলেছিল, যখন ভর্তি হব দেখতেই পাবেন।

ছেলেটা জবাব শুনে একটু হেসেছিল, তারপর শিস্ দিতে দিতে চলে গিয়েছিল।

ঘরে ফিরে কেয়ার গা'টা রাগে জ্বলছিল। বাবাকে বলে দেবে কিনা একবার ভেবেও ছিল। কিন্তু নালিশটা কি ভাবে সাজাবে ওর মাথায় ঠিক ঠিক আসছিল না। তাতে রাগ আরো বেড়ে যাচ্ছিল। স্পর্ধা আছে ছেলেটার!

দুপুরে কখনো কখনো ঘুমোয় বলে আজকাল রাতে ভাল ঘুম হয় না কেয়ার। ভাল ঘুম না হলেই স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে ছেলেটাকে স্বপ্ন দেখল। ওকে হাত ধরে টানছে। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে বসে পড়েছে, পা দুটোকে জাপটে ধরেছে। কেয়া যতই ছাড়াতে চায় আরো জোরে জাপটে ধরে। এরকম একটা টানা হ্যাঁচড়ার মধ্যে কেয়ার ঘুম ভেঙে যায়। ঘামে গা ভিজে গেছে।

জামার বোতাম খুলে আলগা করে দিল শরীর। কী বাজে স্বপ্ন! ওই ছেলেটা ওর পা জড়িয়ে ধরবে? লাথি দেবে না?

সকালে দাঁত মাজতে মাজতে স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল। থুঃ করে খানিকটা পেস্ট মুখ থেকে ঘেন্নায় ফেলে দিল। তারপর অনেকক্ষণ বসে মুখ ধুল যেন স্বপ্নটাকে ধুয়ে ফেলছে।

পরের দিন সকালে বাবার জন্য মাথা ধরার ট্যাবলেট আনতে বেরুতে হয়েছিল। ফেরার সময় দেখল সাইকেলে ম্যাক, মানে ছেলেটাকে। নুয়ে হৈ হৈ করে সাইকেল চালিয়ে ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ব্রেক কষে মাটিতে পা রেখে পিছিয়ে একেবারে কেয়ার গায়ে এসে দাঁড়াল। কেয়া বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে বাড়ীর দিকে হাঁটছে।

মর্নিং। এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?

কেয়া জবাব না দিয়ে হাঁটতে থাকে। ম্যাক সাইকেলের মুখটা ঘুরিয়ে ওর সঙ্গ নেয়। কেয়া যেন খেয়ালই করছে না।

এলাহাবাদের সকাল। পাড়াটা আশ্চর্য শুনশান। লোকজন খুব কম। এখানে সবাই নিজেকে নিয়েই থাকে। জীবন-যাপনে কোনো রকম বাড়াবাড়ি নেই। কাজে যাওয়া, কাজ থেকে ফিরে একটুক্ষণ চারপায়াতে জিরোনো—সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া। আবার ভোরে ওঠা। জীবনে যেন একটাই বৃত্ত। কোন তরঙ্গ নেই, হাওয়া বদল নেই। পুজো পার্বনে যা একটু নড়া চড়া। কোনো বিশেষ তিথিতে যমুনা বা ত্রিবেণীতে স্নান সেরে শিবের মাথায় ফুল চড়ানো। সামান্য এই ব্যতিক্রমেই অনেক সুখ।

ওষুধ কিনলে বুঝি? ম্যাক কেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে।

হ্যাঁ। ছোট্ট করে জবাব দিল কেয়া।

আমাকে বললেই পারতে। এক মিনিটে নিয়ে আসতাম। আমার গাড়ীটা দেখছ তো—ক্লাস ওয়ান রেসিং কার।

আমাদের কাজ অন্যকে বলব কেন?

বাঃ, দরকার হলে বলবে না?

আমার দরকার পড়ে না।

আমার কিন্তু সকলের জন্যে কাজ করে দিতে খুব ভাল লাগে।

দিন না। আমার তাতে কি।

তুমি অত রেগে থাক কেন বল তো? আমরা কি খুব খারাপ লোক?

কেয়ার ইচ্ছে হল বলে, খুব। কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় অতটা

সাহস হল না। তাই কিছু না বলে হাঁটতে থাকল। আর একটু এগোলেই বাড়ীর দেয়ালটা দেখা যাবে। বলতে গেলে, এসেই পড়েছে।

ম্যাক সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বাঁ-ই করে সাইকেলের মুখটা ঘুরিয়ে জোরে চালিয়ে দিল। যেতে যেতে কেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল, বা-ই।

বাড়ী ফিরলে সমস্ত ঘটনা ওর মাথায় পাক দিতে শুরু করে। খুব যে খারাপ লাগছে তা না। তবে কারো অত খোলামেলা স্বভাব কেয়ার ভাল লাগে না।

সকালবেলায় বাবা যেন অন্যরকম। কেয়ার খুব ভাল লাগে। ভোরে উঠে স্নান করবেন। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে গীতার শ্লোক আওড়াবেন। সারা বাড়ীটা তখন পবিত্র। মা চা আর দুটো পরোটা ভেজে বাবার জন্য রেখে যাবে। বাবা খেয়েই বাজারে যাবেন। ফিরে এসে খবরের কাগজ। কোন কোন দিন কেয়াকে ডেকে একটু গল্প করবেন। তোরা তো বাংলা ভাষাটাই ভুলে যাচ্ছিস। জানিস রবি ঠাকুরের চাইতেও বড় কবি ছিলেন মাইকেল ? কেয়ার তখন বলতে ইচ্ছে করে চলনা একবার কলকাতা ঘুরে আসি। কিন্তু কেয়া জানে ওকথা বললেই বাবা বলবেন, আমরা কি আর বাঙালী আছি রে! এখন যে-দেশে পয়সা রোজগার করি সে দেশের লোক আমরা।

বাবা অফিস চলে গেলে বাড়ীটা একেবারে মরে যায়। আর যেন সাড়া থাকে না।

ম্যাক শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নামে। ওদের ঘরে কিছু না কিছু হুল্লোড় লেগেই থাকে। রেকর্ড বাজে, গান হয়, উঁচু শব্দে রেডিও চলে। লোকজনও কম না! ম্যাকের বাবা পাঁড় মাতাল। রাত্রে মাঝে মাঝে ভীষণ চেঁচামেচি করে। দুমদাম ভাঙচুরের শব্দ হয়। কেয়া শোনে। কেয়ার বাবাও নেশা করেন। মার তাতে খুব দুঃখ। নেশা করা লোক দেখলেই কেয়ার খুব ভয় করে। এমন কি বাবাকেও।

কেয়ার মনে হল ম্যাকও নিশ্চয় নেশা করে। কোনদিন সুযোগ

হলে কথাটা সে জিজ্ঞেস করবে ম্যাককে। ও কেন জিজ্ঞেস করবে ? ম্যাক যা ইচ্ছা করুক না, ওর তাতে কী ? ম্যাকের কথা ভাবছে দেখে নিজের ওপর রাগ হয় ওর। রেজাল্টটা বের হ'লেই বাঁচে, তখন আর এমন একা একা থাকতে হবে না। একা একা থাকলেই যত সব আজেবাজে ভাবনা। অথচ আগে ভাবনা চিন্তা কিছুই ছিল না, ম্যাকও ওর সঙ্গে কথা বলত না। আবার ম্যাক! ও রান্না ঘরে মার কাছে গিয়ে বসে। মার সঙ্গে একটু কাজে হাত লাগাতে ইচ্ছা হল ওর।

কিরে কিছু বলবি ? কেয়াকে পাশে বসতে দেখে মা জিজ্ঞেস করল।

কি আবার বলব ? রান্নাঘরে বুঝি আসতে নেই ?

আমি দ্যখি সে-কথা বললাম!

তবে দাওনা কিছু একটা করি।

রক্ষে কর! কিছু আর করতে হবে না আপনাকে। তবেই হয়েছে!

কেয়ার অভিমান হয়। ও যেন ছোট্ট মেয়েটি রয়ে গেছে। পাশ করলে কলেজে যাবে, অথচ মা ওকে একটুও বড় বলে ভাবতে পারে না। মা বলে মার নাকি চোদ্দ বছর বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। প্রায় দু বছর হতে চলল বয়সটা সে পার করে দিয়েছে, মা কি ওর দিকে তাকিয়েও দেখে না ?

সে দিন রাত্রে চাঁদ উঠল। কেয়া জানলা দিয়ে তাকিয়ে এই প্রথম জীবনে একটুখানি কাঁপল। অবাক লাগল কেয়ার। ম্যাকের বাবা নিশ্চয় এখন মাতাল হয়ে জামা জুতো পরেই শুয়ে পড়েছে। ঘরের সবুজ বাতিটা চাঁদের আলো-কে বাইরে ঠেকয়ে রেখেছে। ম্যাকও হয়ত জড়োসড়ো হয়ে বাবার কাছাকাছি কোথায় ঘুমোচ্ছে।

কেয়ার মাথার মধ্যে এই 'শুয়ে থাকা' কথাটা ভিন্ন একটা অর্থ নিচ্ছে। ওর কান মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কেয়া বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাশের খাটে মা অঘোরে ঘুমচ্ছে। বাবা অন্য ঘরে।

মার শরীর থেকে আঁচলটা সরে গিয়েছে, সেখানে খানিকটা চাঁদ এসে নিরিবিলি এলিয়ে আছে।

কেয়া আলো না জ্বালিয়ে খুট করে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নায় শহরটা যেন টসটস করছে। একবারও ধান-ক্ষেতের কথা মনে পড়ল না।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নিজের ছায়াটা আগের চাইতে অনেক বড়। সেই বাইশ তেইশ বছরের ছেলেটা, যে কিনা ফাউন্টেনপেন সাজিয়ে গাছের ভাঙা ভাঙা ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকে, তার মুখটা যেন জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় হঠাৎ হঠাৎ আকার নিচ্ছে। নির্জন প্লাবিত চাঁদে কেয়ার মনে হল সে স্কার্ট জামা খুলে ভিন্ন এক বয়সের পাদানিতে পা রাখবার জন্যে অবশ অনিবার্য এগুচ্ছে এখন।

অতীশের চিন্তা-ভাবনা

বুম্-বুম্-বুম্। শব্দটা পেটোর না ভূমিকম্পের না কারো কণ্ঠনির্গত হর হর ব্যোম্ অতীশ বুঝে উঠতে পারল না। খানিকক্ষণ থ' হয়ে বসে রইল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। তারপর সেই শব্দগুলোর উৎস এবং তাৎপর্যের জন্য উত্তরোত্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল, আর ঠিক সেই বিন্দু থেকেই শুরু হল উত্তেজনা। একটা কম্পমানতা যেন বেনো জলের মত বেড়ে বেড়ে চিন্তা ভাবনাগুলোকে ডুবিয়ে দিতে থাকল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। সে বিছানা থেকে উঠে এসে হাঁটু মুড়ে চেয়ারে বসল। বাঁ হাতের চেটোয় গালটা শুইয়ে দিয়ে ভাবতে থাকল শব্দগুলো কীসের! অনেকসময় টিক্-টিকির টিক্ টিক্ শব্দও হালকা ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর হয়ে কানে আসে। শব্দগুলো নিশ্চয় টিক্‌টিকির। মিছিমিছি আতঙ্কিত হয়েছে সে। চিন্তাস্রোত একটা সিদ্ধান্তের দিকে মোড় নেওয়াতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল অতীশ।

মাথাটা হালকা হতে অন্য একটা দৃশ্যও মনে পড়ে গেল তার। সেটাও স্বপ্নের দৃশ্য। শব্দগুলোর ঠিক আগে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল প্রাপ্তবয়স্কা নুপুরীর ঘনশ্যাম স্তনদুটো। নুপুরীর ঘরে সে যাতায়াত করে, মেয়েটা ভাল তবে বড্ড টাকার কামড়। তা হোক, এখন তো আর প্রেম ভালবাসার বয়স নেই, যা কিছু দরকার টাকা দিয়েই সারতে হয়। সুতরাং কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ব্যবহারটা ভাল হলেই খদ্দেররা খুশী। অনেক মেয়ে এই সার সত্যটা বোঝে না। তবে নীচু পাড়ার মেয়েগুলো ভাল হয়। নীচু পাড়াতেই আবার খদ্দেরদের অত্যাচারটা বেশী।

তোষকটা উল্টে দেখল কী পরিমাণ টাকা এখনো হাতে আছে। গুণে গুণে দেখল অতীশ। না, নুপুরের কাছে যাওয়া যাবে না। তবু কোথাও না কোথাও যেতে হবে। বাড়ী বসে থাকলে সন্ধ্যেবেলা থেকে একটা অসহায় ক্লান্তি তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত তখন অসহ্য, বিস্বাদ।

হলুদ প্যাণ্টের ওপর চিকণের কাজ করা পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে অতীশ বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে থাকে চৌরঙ্গীর দিকে। পথে থিক্‌থিকে ভীড়, প্রায়-উলঙ্গ ভিখারীর সঙ্গে বেল-বট্‌স ঠাসা মেয়ে-গুলোর আশ্চর্য সহবস্থান। অতীশের মনে হল কলকাতার মত ভাল্‌গার সহর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

চৌরঙ্গীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী প্রাসাদগুলো এখন জনগণের। যেমন জাদুঘর। দিনেও লোকের অন্ত নেই আর দিন ফুরোলেও থোকা থোকা মানুষের ছোট ছোট ঘূর্ণি। রঙ্‌-টঙ্‌ মেখে শরীরটাকে শাড়ির বাইরে ঠেলেঠুলে ল্যাম্পোষ্ট বা ভুতুড়ে গাছের আশেপাশে মেয়েরা এসে দাঁড়ায়। মেলা জমে। পুলিশ আছে। মালিশওয়ালা আছে। রিক্‌সা-ট্যাক্‌সির মন্থর গমনাগমনে যেন একটা নিষিদ্ধ মৃগয়ার আবহাওয়া। এইসব দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল অতীশ। দাঁড়িয়ে পড়ে একটি মেয়েকে তাক্‌ করল। মেয়েটার সামনে, না পেছনে, না পাশে কোথায় দাঁড়াবে এইসব ভাবতে ভাবতে কিছুটা সময় গেল। আর ঠিক সেই সময়টুকুর মধ্যেই অন্য একজন পুরুষ এসে মেয়েটার গা ঘেঁসে জমে গেল।

অতীশ লোকটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হল। এখানেও সেই ত্রিকোণ সম্পর্কের নাটক? লোকটাকে অ-বাঙালী মনে হল অতীশের। অর্থাৎ এখন একটা আন্তঃ প্রাদেশিক চিত্র। লোকটার সঙ্গে কিছুক্ষণ চাপা প্রতিযোগিতা চালাল, কিন্তু এই সব মুহূর্তে প্রতিযোগিতার চাপ সহ্য করার কোন মানে হয় না। এখন, দুটো পথ খোলা: হয় পশ্চাদপসরণ নতুবা আপোষের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা। অতীশ ভাবল কূটনৈতিক তৎপরতার পথটাই নেবে। আচ্ছা যদি এভাবে শুরু করা যায়ঃ দেখুন, বস্তুর যোগান কম হলেই মহার্ঘতা বাড়ে, তাই না? এই মুহূর্তে দুজন পুরুষের জন্য জোগান মাত্র একটি স্ত্রীলোক সুতরাং এখন সমস্যা হল বণ্টনের। দেখা যাক, বণ্টনের একটা যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা। বণ্টনের ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক শক্তি হতে পারে সময়। আমাদের এই খেলার যোগ্য আম্পায়ার হল সময়। অবশ্য এ বাদেও আরো

কিছু সমাধান আছে, যেমন আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি আত্মহত্যা করি, আর আত্মহত্যার ব্যাপারে 'টস্' করাটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাছাড়া 'ডুয়েল'ও লড়তে পারি, তবে সেটা হবে জঘন্য নাটকীয়তা, ফিউডাল। অথবা—

এইরকম তাত্ত্বিক চিন্তায় অতীশ যখন আচ্ছন্ন, সেই সুযোগে নেকড়ের মত একটি ট্যাক্সী নিঃশব্দে এগিয়ে, দরজা খুলে স্ত্রী-লোকটিকে গিলে বেগবান ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্য পুরুষটি এতক্ষণে শব্দ করল, বাঃ রাজা বাঃ।

কথা তিনটির উচ্চারণ এবং অর্থ হিন্দী ও বাংলা ভাষায় হুবহু এক।

অতীশ বুম্-বুম্ শব্দটাকে অভিশাপ দিল। শব্দটা কী কিছুর ইঙ্গীতবহ? কলকাতাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করে না সে। শুরুতেই যখন বাধা, বলা যায় না, আরো কত কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তাটা পার হয়ে মাঠের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে সে। খানিকটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হল মাঠের বিস্তির্ণ অন্ধকার একটা ঠাস বুনোন জালের মত দিগন্ত অবধি ছড়িয়ে আছে। ঘাসের উপর বসে পড়ল অতীশ। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পরম আরামে। শুয়ে পড়ে সে আবিষ্কার করল কলকাতার আকাশেও চাঁদ ওঠে। আর চাঁদটা ঠিক তার ছোটোবেলায় দেখা চাঁদের মত বড় ব্যক্তিগত।

কৈশোরে বড় অল্প পুঁজি ছিল অতীশের—একটা মাত্র ঘোলা জলের খাল। বাড়ী থেকে কয়েক পা পাশেই। জলে ভাসত কচুরী-পানা। দুপাশে আশশ্যাওড়া, বিছুটি আর কাঁটা-খেজুরের অবান্তর জটলা। বর্ষার জল পড়লে ডাগর হয়ে উঠত সে সবের সবুজ রঙ; আর শীতে লাগত ছন্নতা। একটা কাঠের পোলও ছিল খালটায়। একটু বেঁকে অন্য একটা পাড়ার মধ্যে দিয়ে সটান গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে খালটা। এই ছিল অতীশের পুঁজি। কতদিন যে সেখানে চাঁদের আলো এসে মসৃণ তৈলাক্ত কাদায় আটকে যেত! ঘোলা জলের সঙ্গে লক্ষ মাইল দূরের নক্ষত্রপুঞ্জের চলত ছোঁয়াছুঁয়ি—নির্জনে ডাকত

ঝিঁঝিঁ। খালটার কথা মনে পড়তেই অতীশের ইচ্ছে হল, এই এমনি সারারাত সারাদিন আজন্ম যদি সে শুয়ে থাকতে পারত!

মনে পড়ল অতীশের গোটা জীবনটার মত কৈশোরও এক পরম্পরাহীন অনিবার্যতায় নিশ্চিহ্ন। যেন গত-জন্ম। যদি, ঐ যে ঘোলা জলের খালটা, যা ছিল একমাত্র পুঁজি, সেটুকুতেই তার জীবনটা আটকে থাকত তাহলে কৈশোরটাকে কী গত-জন্ম মনে হত? একটা পরিণতির মত যথার্থ মনে হতে কিছুমাত্র বাধা হত না।

সবকিছু তছনছ করে দিল ছোটকাকীর বোন, যার গায়ের রঙ্ ছিল অদ্ভুত। একটু ছুঁলেই লাল হয়ে উঠত, অথচ বয়স ছিল সবে পনেরো। গ্রামের মেয়েরা অবশ্য ঐ বয়সে স্বামীর ঘরে চলে যায়। গিন্নী সাজে, কিন্তু ছোটকাকীর বোন ছিল যেমন নির্বোধ তেমনি অসম্ভব মেয়েলী ও ছেলেমানুষ। তাকে যখন অতীশ আবিষ্কার করল, ভাবতেই পারেনি মেয়েটা কোনো ঘটনার উৎসমুখ হতে পারে।

এখন যদি অতীশকে কেউ জিজ্ঞেস করে, অতীশের কে কে আছে, তাহলে বিষণ্ণ মুখে সে জবাব দেবে, কেউ না। ছোটবেলায় মা-বাবা গত হয়েছেন, তারপর এর ওর দোরে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ। কিন্তু কথাটা আদ্যান্ত মিথ্যা। এখনো মা-বাবা-ভাই-বোন-কাকা-জ্যেঠা-পিসী-চাকর বাকর-প্রাচীন-বেঢপ-শ্রীহীন-বাড়ী-মামলা-মোকদ্দমা-গোপনে বেশ্যাবাড়ী গমন—মদ্যপান—গর্ভপাত—প্রেম—বিরহ ইত্যাদি পড়ে যাওয়া উচ্চবিত্ত সংসারে যেমন থাকে সবই আছে, শুধু সেই মৌচাকে অতীশ নেই।

হ্যারিকেন জেবলে বার-বাড়ীর কোঠায় যখন অতীশ পরীক্ষার পড়ায় মগ্ন, কাকীমার বোন সরলা সেই কৃপণ মাসটাতেই বেড়াতে এসেছিল কাকীমার হাত ধরে। সবুজ ফ্রক আর গায়ের রঙ্ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ার মত ছিল না। কিন্তু একদিন বিকেলে সরলাকে তার পড়ার ঘরে দেখে যেন আরো অনেক কিছু দেখেছিল সে। অতীশ ঘরে ঢুকতেই মেয়েটা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। পড়ার টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল গোবৎসের মত বড় বড় চোখ দুটোয় বিভ্রান্তি ও বিস্ময়কর একটা অপরাধ-বোধ নিয়ে।

অতীশ তাকে হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর

অপার কৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কী হল, অমন কাঠ হয়ে বসে আছ কেন? কথা বল! সরলা নীচু চোখে তখন নখ খুঁটছিল, ঘেমে উঠেছিল তার ছোট আদুরে কপালটা। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলেছিল, 'আমি যাই',—উঁ-হু, এসেছ যখন, তখন আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। সরলা যেন দুটো দুর্বোধ্য শব্দ শুনল। গল্প করতে হবে! বাবাঃ গল্প তো বন্ধুদের সঙ্গে করে, অতীশের সঙ্গে গল্প করার বয়স নাকি তার। কত উঁচু ক্লাসে পড়ে। সরলা মাথাটা আরো নীচু করে চুপচাপ বসে রইল। অতীশ তার কপালটা ধরে মাথাটা ঠেলে উঠিয়ে চোখে চোখ রেখে বলেছিল আমি কী বাঘ? খেয়ে ফেলব নাকি? সরলার কপালের ঘাম লেগেছিল অতীশের চেটোয়। সরলার ফ্রকে ঘামটা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেছিল, বই পড়? সরলা যেন স্বাভাবিক হবার অবসর পেল, চোখ তুলে বলেছিল, না, ছবি দেখতে খুব ভাল লাগে। কথাটা বলতে পেরে যেন দম ফেলে বাঁচল। একটু চুপ করে থেকে স্বাভাবিক গলায় অতীশকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে ছবির বই আছে? সারাদিন আমার সময় কাটে না। অতীশ জবাব দিয়েছিল, অ-নে-ক। কত ছবি তুমি দেখবে, শেষকালে বলবে, ছবি দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। ফিক্ করে হেসে দিয়েছিল সরলা, ছবি আবার খারাপ লাগে নাকি কারো। লাগে না? রোজ দেখলে সবাইরই লাগে। আমাদের খালটা তুমি দেখেছ? সরলা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা তাহলে বল তো খালটা দেখতে ভাল লাগে, না খালের ছবি?

কথাটা কখনো ভাবেনি সরলা। তাকে বেশ চিন্তিত দেখালো। তবে খালটার কথা আসতেই সরলার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, কুমীরের কথা।—আচ্ছা খালে নাকি কুমীর থাকে?

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল অতীশ, কুমীর? দূ-র, আমাদের খালে কুমীর-টুমীর নেই। কে বললে খালে কুমীর থাকে?

সরলা অতীশকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। দিদি তাকে বলেছে খালে কুমীর থাকে। দিদি মানে অতীশের কাকীমা।

ছোটকাকী বলেছে? হেসে উঠেছিল অতীশ, তারপর

সরলাকে বলেছিল, এদিকে এস, আসল কথাটা কানে কানে বলছি, কাউকে বোলোনা কিন্তু। সরলা বড় বড় চোখ করে অতীশের মুখের কাছে কানটা এগিয়ে দিয়েছিলো। কানে একটা ছোট্ট সোনার দুল, চিক্‌চিক্‌ করে দুলছিল। অতীশ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, তুমি যাতে খালের দিকে না যাও তাই ভয় দেখিয়েছে। কুমীর থাকে আফ্রিকায়। সরলা এবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, দিদিটা এমন মিথ্যুক! আমি কিন্তু সত্যি ভেবে ভয়ে মরি আর কি। অতীশ তখন বিজ্ঞের মত সরলার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হাসি থামিয়ে সরলা জিজ্ঞেস করেছিল, আফ্রিকা কী? আফ্রিকা একটা মহাদেশ, সন্ধ্যেবেলা যখন পড়তে বসব, এসো, সব বলে দেব। কথাটা শেষ করে সরলার মাথায় একটা চাঁটি মেরে, মাঠে যাচ্ছি বলে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

অতীশের জ্যাঠামশায়ের ছিল পাকানো শরীর, খাঁড়ার মত নাক, ঋজু মেরুদণ্ড। মাথার অর্ধেক চুল পাকা। সারাদিন গাঁজা খেতেন। গাঁজাকে বলতেন সিদ্ধি। চোখদুটো সর্বক্ষণ ঘোলাটে ও রক্তবর্ণ, তাই সহজে কেউ ওঁর সামনে আসতো না। উনিও কাউকে খুব বেশী বিরক্ত করতেন না। গাঁয়ের লোকেরাও ভদ্র-লোককে দেখলে আত্মরক্ষার তাগাদায় ওঁর কাছ থেকে সরে যেত। প্রায়ই বুঁদ হয়েই চলাফেরা করতেন। তাই এসব নজরে আসত না তাঁর। কিন্তু যদি টের পেতেন কেউ তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলেই দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দিতেন, 'এ্যা-ও, এই যে, এদিকে এস। বাবার বয়েসীকেও তিনি তুমি বলতেন।

পালাচ্ছ কেন? স্বয়ং মহেশ্বরও তো সিদ্ধি খান, তাঁর মাথায় জল দিতে তো হাতে কুষ্ঠ হয় না! শুধু আমাকেই বুঝি তাচ্ছিল্য? এ্যাঁ, আর যেন এরকম অসভ্যতা না দেখি। যা-ও। লোকজন পালাতে পারলে তখন বাঁচে। সকলের ধারণা লোকটা যা-নয়-তাই করতে পারে। ধারণাটা অবশ্য অকারণ না।

একদিন সকালে জল-টল খেয়ে, এক ছিলিম চড়িয়ে, নিবিড় সুখে একা একা হুঁকো খাচ্ছিলেন তিনি। মাসটা ছিল কার্তিকের শেষাশেষি। বাতাসে শীতের টান। জ্যাঠামশায় পরম প্রসন্ন। এমন

সময় ওঁর গুরুদেব, যাঁর কপালে ছিল রক্ত-তিলক, গায়ে একটা ভাঁজ করা মোটা ধুতি, হাঁক দিলেন, মায়েরা সব কুশল তো? গুরুদেব ঢুকেই জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেলেন। মা, জ্যাঠাইমা, কাকীমা, সবাই গুরুদেবের গলা শুনে ছুটে এসছিলেন ঘোমটা টানতে টানতে। জ্যাঠাইমা ওঁকে প্রথমে প্রণাম করেছিলেন তারপর ভক্তিভরে একটা আসন পেতে দিয়েছিলেন জ্যাঠার মুখোমুখি। গুরুদেবকে কিছু-মাত্র গ্রাহ্য না করে একবার শুধু রক্তবর্ণ ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকিয়ে আবার নিজের মৌতাতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

গুরুদেব জ্যাঠামশাইয়ের সামনে বসে উসখুস করছিলেন। কী ভাবে শুরু করবেন বোধ হয় ভাবছিলেন। জ্যাঠামশাই নির্বিকার। চুপচাপ থাকাটা ঠিক হচ্ছে না ভেবে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কথা শুরু করলেন গুরুদেব। কিন্তু বিষয় নির্বাচনে করলেন মারাত্মক ভুল। জ্যাঠামশাইকে কিছু সৎ উপদেশ শোনাবার বাসনায় বলেছিলেন, বাবা মহেন্দ্র, ইদানীং দেখছি তোমার যথেষ্ট স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। খাওয়া-দাওয়ায় কী ত্রুটী ঘটছে? জ্যাঠামশায় মুদ্রিত নয়নেই খুব ছোট্ট করেই জবাব দিয়েছিলেন, হুঁ-হু। গুরুদেব আর একটু এগোলেন, অত্যধিক নেশাসক্তি কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ঘটায়, এদিকটাতে একটু নজর দেওয়া উচিৎ তোমার। কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি কিন্তু বিপজ্জনক। পংক্তিটা বোধ হয় তখনো শেষ হয়নি, জ্যাঠামশায় হাতের হুঁকোটা রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের কাছে পেলেন কাঁসার একটা ভারী বাটি, সেটা তুলে সোজা বসিয়ে দিলেন গুরুদেবের মাথায়। গুরুদেব বিকট আর্তনাদ করে লাফিয়ে পড়লেন উঠোনে, বৌ-ঝিরা ছুটে এলো চিৎকার শুনে। গুরুদেবের কপাল ফেটে তখন রক্ত গড়াচ্ছে শরীরে, তোরা সবাই দেখ, গেঁজেলটা আমায় খুন করেছে, ওর সর্বনাশ হবে······গেঁজেলটা আমায় খুন করল রে, বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি। জ্যাঠামশায় কোনোদিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে চিৎপাত শুয়ে পড়লেন খাটে।

এ ঘটনার পর থেকে জ্যাঠাকে ভুলেও কেউ ঘাঁটাতে চাইত না। ঘাঁটানো তো দূরের কথা, সহজে কেউ কাছাকাছি আসত না ওঁর।

উনিও চাইতেন না কেউ ও'কে বিরক্ত করুক।

সন্ধ্যার শাঁখ বাজানো ও তুলসীতলায় বাতি দেওয়া হয়ে গেলে, সরলা পায়ে পায়ে চলে আসত বার-বাড়ী অতীশের পড়ার ঘরে। হ্যারিকেনের সামনে মাথা ঝুলিয়ে অতীশ বই খুলে বসে থাকত সরলার অপেক্ষায়। ছবি দেখার চাইতে খুনসুটি করা, গল্প করাতেই সরলার বেশী উৎসাহ। ওদের ভারী ছায়া দুটো দুলত দেয়ালে। ছায়াগুলোর আকৃতি বদলে যেত সামান্যতম নড়াচড়ায়। হ্যারিকেনের হলুদ আলোয় ফ্রকের অন্তিমে বেরিয়ে আসা পা দুটোর রক্ত মাংস ভিন্ন একটা ব্যাপার যেন। আর তাতে একরকমের আচ্ছন্নতাও টের পাচ্ছিল সে। অতীশের মন পড়ে থাকে কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে। কতক্ষণে সরলার শরীর ঘরটা দখল নেবে।

অতীশ যতটা নির্বোধ ভেবেছিল সরলা অতটা নির্বোধ না। গায়ে হাত পড়লে চট্ করে সরিয়ে নেয়, বসবার সময় ফ্রকের ঝুল পায়ের নিচের দিকটাতে টেনে দেয়। মাঝে মাঝে এমন চোখ নাচায় যার কোনো কারণ বোঝে না অতীশ। একদিন হুটোপুটির সময় টেবিল থেকে হ্যারিকেনটা ছিটকে পড়ে দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গিয়েছিল হঠাৎ। অন্ধকারে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি সরলা, ছুটে গিয়েছিল ভেতর বাড়ীতে।

বাতি না থাকলে অতীশের সঙ্গে ঘরে থাকাটা যে বিপজ্জনক হতে পারে, পনেরো বছরের সরলা তাহলে বোঝে!

একটা অনিবার্যতা অতীশকে অল্প কদিনের মধ্যেই পূর্ণ বয়সের পুষ্টি এনে দিয়েছিল আর সরলাকে দিয়েছিল রমণীর চিরন্তন রহস্যময়তা।

সরলা এখন সুযোগ পেলেই দিদির শাড়ি পড়ে। দিদি সরলার শাড়ি পরাটা একটুও পছন্দ করে না, 'ধেড়েমী করতে খুব মজা লাগে, তাই না? খোল্ খোল্। দাঁড়াও বাবাকে লিখে দিচ্ছি। বাড়ী গিয়ে যত খুশী শাড়ি পোরো।'

অভিমানে চোখে জল আসে। সবাই তাকে এখনো ছোট মেয়ে ভাবে কেন? কী এমন ছোট সে? কথাটা অতীশের কাছে বলতে বলতে যেন উত্তরটা জানতে চাইছিল, অতীশই বলুক সে এখনো

ছোট কি না ?

অতীশ কেন জানি তাকিয়ে থাকতে পারছিল না সরলার দিকে। জানলা দিয়ে তাই বারবার তাকাচ্ছিল অন্ধকারে যেখানে থোকা থোকা জোনাকি। সরলা ওর পিঠের দিকে দাঁড়িয়েছিল, অতীশ বসেছিল চেয়ারে। সরলার ছায়াটা বিরাট হয়ে দেয়াল বেয়ে সোজা ছাদে গিয়ে ঠেকেছিল। মাথাটা দেখাচ্ছিল ভয়ংকর রকম চওড়া। দৃশ্যটা অতীশের একটুও ভাল লাগল না। তোমার ছায়াটা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে আমায়, ছায়াগুলো মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী হয় না! তারপর চেয়ারের একদম ধারে সরে গিয়ে সরলাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে নিল। সরলা ঝুপ করে বসে পড়ল, আর ছায়াটাও ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে এল।

সরলার হাতটা তখনো ছাড়েনি অতীশ, অন্য হাতটাও ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সরলাকে একদম বুকের মধ্যে টেনে নিল। সরলা কোন প্রতিবাদ করল না, তবু বুকটা যেন কেমন থরথর করে কেঁপে উঠল।

অতীশ সরলাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারল না, অথচ ভীষণ একটা কিছু যে করতে হবে, এবং সেই করাটা এই মুহূর্তে কত অনিবার্য, তা অতীশের বুদ্ধির অতীত একটা শক্তি যেন চাবকে জানিয়ে দিচ্ছিল তাকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের শরীরের মধ্যে লুপ্ত করে দিতে চাইল সরলাকে। ফ্রকের বোতামগুলো টেনে পট্-পট্ করে খুলে ফেলল, তারপর কাতর হয়ে সরলার নগ্ন বুকে মুখটা ঘষতে থাকল! সরলাও ওর মাথাটা জাপটে ধরেছে। ততক্ষণে অতীশের বাঁ হাতটা নামতে নামতে সরলার নাভীর কাছে ইজেরের দড়িতে এসে ঠেকেছে। সরলা ছট্‌ফট্ করে উঠল, হাত দিয়ে চেপে ধরল অতীশের বাঁ হাতটা। গোঙানীর মত একটা শব্দ হল সরলার কণ্ঠনালীতে।

এ্যাই, এ্যাই, কে ওখানে—জ্যাঠামশায়ের হুঙ্কারে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সরলাকে ঠেলে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল অতীশ। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাঠা—ঋজু, রক্তবর্ণ চোখ। এক মুহূর্ত ভাবল অতীশ। তারপর জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা তুলে

সোজা ছুঁড়ে মারল জ্যাঠামশায়ের চোখ দুটো লক্ষ করে। জ্যাঠামশায়ের মুখে লেগে হ্যারিকেনটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। একটা জান্তব চিৎকার করে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি, আর সেই অবসরে অতীশ ঘর ছেড়ে উঠোনে। উঠোন ডিঙিয়ে মাঠে, মাঠ থেকে সোজা কলকাতায়।

রেলের অজস্র স্লিপারে জ্যোৎস্নার নৈঃশব্দ। কাছের বস্তিটা থেকে ছুটে আসছিল ফুটন্ত আতপ চালের গন্ধ, কিন্তু কোথাও পেঁচার কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল না অতীশ।

ভাতের গন্ধে পেটে মোচড় দিল। প্ল্যাটফর্মের নির্জন বেঞ্চিতে বসে থাকতে পারল না অতীশ। উঠে, হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের শেষে এসে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল, তারপর তরতর করে হাঁটা দিল বস্তিটার দিকে। খাপড়ার চাল আর মাটির দেয়াল ঘেরা চতুষ্কোণ ছোট ছোট গুহায় মানুষের ঘর সংসার। কোনো ঘরেই জানলার অস্তিত্ব নেই, তার মধ্যেই কুপি জেবলে রাত্রের রান্নাবান্না। পুরুষেরা সকলেই খালি গা, কারো কারো গায়ে পৈতে। মেয়েদের গায়ে খাটো একটা শাড়ী মাত্র। ওদের সমর্থ শরীরে পোশাকের কোনো ভিন্ন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না, পোশাক যেন একান্তই বাহুল্য।

অতীশ ছায়ামূর্তির মত একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। খাটিয়া পেতে কেউ একজন শুয়েছিল ওখানে। অতীশকে দেখে উঠে বসল।

কী চাই ছোকরা—অতীশের গলা শুকিয়ে কাঠ। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অতীশ চুপচাপ। কী হে, বোবা নাকি—বল কি চাই ?

দুটো খেতে দেবেন, ভয় পেতে পেতে বলে ফেলল অতীশ। কেন ? দেখে তো বাবা ভিখিরি মনে হয় না ? আসল কথাটা বল তো ছোকরা। তারপর হাঁক পাড়ল, বাতিটা আন তো, বদনটা দেখি একবার।

কার আবার বদন দেখবে, খদ্দের এল নাকি ? বলতে বলতে একটি মেয়েছেলে, বোধ হয় মানুষটার স্ত্রী, কুপি হাতে অতীশের

সামনে এসে দাঁড়ায়। কুপিটা মুখের কাছে এনে দুজনেই ভাল করে দেখল অতীশকে। অতীশের মনে খদ্দের কথাটা ঘুরঘুর করছে তখন। খদ্দের মানে? কোথাও কোনো বিক্রীর মালপত্র তো চোখে পড়ছে না। তবে খদ্দের আবার কিসের?

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অতীশের দিকে তারপর মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বলতো কে তোকে পাঠিয়েছে?

অতীশ ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি কেউ আমাকে পাঠায়নি। প্ল্যাট-ফর্মে শুয়ে ছিলাম। ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছিল, তাই—

শালা, ঝুট বলছিস, প্ল্যাটফর্মে যারা শোয় সব শুয়োরের বাচ্চাকে আমি চিনি, ওরাও আমাকে চেনে। বল কে তোকে পাঠিয়েছে? না যদি বলিস হাপিজ হয়ে যাবি শালা।

অতীশ লোকটার মেজাজ এবং কথাবার্তা শুনে ভয়ে কাঠ, ক্ষিদের কথাটার মনে পড়ছে না আর। থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

এতক্ষণ মেয়েমানুষটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, ফোঁপানি শুনে মুখ খুলল, সত্যি বলছিস তোকে কেউ পাঠায়নি? কেন এসছিস তাহলে বল তো? কথায় স্নেহের আভাস পেয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেলল অতীশ। এবার যেন ক্ষিদেটা পেটে চাড় দিল। কান্না ভাঙা গলায় বলল, যদি কিছু খেতে পাই তাই এসছিলাম। মেয়েমানুষটা বিশ্বাস করল অতীশকে। ভাল করে তাকালো খুটিয়ে খুটিয়ে, মনে হল না ছেলেটার কোনো বদ উদ্দেশ্য আছে। নেহাৎই ক্ষিদের জ্বালা।

এবার লোকটাকে বলল, একটা পুঁচকে ছোড়াকে তোমার এত ভয়। ব্যবসাটা তুলে দিলেই পার। তারপর লোকটাকে গ্রাহ্য না করেই বলল, চল্ খোকা ভেতরে আমার কাছে বসবি। কিছু ভয় নেই তোর। লোকটা কিছু একটা বলতে গিয়েও চেপে গেল। 'যা মন চায় কর্' বলতে বলতে আবার খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল।

কলকাতা মানে হাওড়া। পালিয়ে এসে হাওড়া স্টেশনে একদিন একরাত পড়েছিল। কিন্তু হাওড়া স্টেশন নিরাপদ মনে হয়নি তার।

হরদম চেনা লোকের আসা-যাওয়া। সুতরাং হাওড়া স্টেশন ছাড়তে হয়েছিল গয়া প্যাসেঞ্জারে চেপে। তাও বেশী দূর যাওয়া হয়নি। চেকার এসে হাজত বাসের ভয় দেখিয়ে, পকেটগুলো হাতড়ে দয়া করে নামিয়ে দিয়েছিল ছোট একটা স্টেশনে। অতীশ ছাড়া সেদিন আর কেউ সেখানে নেমেছিল কিনা অতীশের মনে নেই। কি আর করে, প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে খানিকক্ষণ একলা বসে তারপর শুয়ে পড়েছিল টানটান। ধান্দা ছিল অন্যকোনো গাড়ী এলে আবার উঠে পড়বে। এর মধ্যে সেই আতপ চালের গন্ধটা সব গোলমাল করে দিল।

মহিলা শুধু যে রাতে তাকে খেতে দিয়েছিল তাই না, কেমন করে যেন টের পেয়েছিল কোনো একটা দুষ্কর্ম করে ঘর ছেড়েছে ছেলেটা। লোকটাও নিশ্চিন্ত হয়েছিল, বিপদের কোনো আভাস না পেয়ে। অতীশকে সে তার ব্যবসাতে লাগিয়ে নিল। ওর ব্যবসাতে পরদেশী ছেলেরাই বিশেষ উপযুক্ত। ব্যবসা চোলাইয়ের। নানা ঠেকে চোলাই পেঁছে দেবার কাজ। বদলে দুবেলা খাওয়া আর আশ্রয়।

অতীশের সেই ঘোলা জলের খালটা যে কোথায় ভেসে গেল, চোলাই পাচার করতে করতে জানতেই পারল না সে। এখন শুধু রেলের স্লিপারে জ্যোৎস্না মাড়িয়ে সতর্ক হয়ে হাঁটা চলা। চোলাই না তো যেন বিষে-ডগমগ গোখরো সাপ, অসতর্ক হলেই অনিবার্য ছোবল।

সাধুটা বলেছিল, চল্ বেটা চল্, এখনো তুই বরম্‌চারী আছিস, তোর হবে। লেগে যা বেটা। কোথায় যে যেতে হবে বলছে অতশত বুঝত না অতীশ। কিন্তু বিরাট তেঁতুল গাছের তলায় একমাথা জটা নিয়ে, গায়ে ছাই মেখে ত্রিশূল গেড়ে বসে থাকার ভঙ্গীটা অতীশের দারুন লাগত। গায়ে এক ফোঁটা মাংস নেই। হাড়-পাঁজরা লেপটে রুক্ষ বিবর্ণ চর্মসার শরীরে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো ছিল দেখবার মত। করুণা নয় কেমন একটা রাশ টানা বন্যতা। নেশা লাগায় মনে। চোলাই খেলেও ঠিক এ ধরনের একটা অনুভূতি

পাওয়া যায়। অতীশ এখন মাঝে মাঝে চোলাই খায়। মেয়েমানুষটিই খাওয়ায় তাকে।

শুধু চোলাই খাওয়ানো না, মাঝে মাঝে জাপটে ধরে, দুই উরুর খাঁজে কোমরটা চেপে অসহ্য যন্ত্রণা দেয় তাকে। পুরুষটা দেখতে পেলে বলে, দুধের বাচ্চাটার সঙ্গেও ছেনালী করিস মাগি, মরিস না কেন? মেয়েমানুষটি জবাব দেয়, তুই তো ঢ্যামনা হয়ে গেছিস। খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে লোকটি, হাসতে হাসতেই বলে, শালা, আমার যে কি হয়ে গেল—কথাটা শেষ না করেই অন্য কথায় চলে যায় কতটা গিলেছিস, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে। শরম নেই তোর? টেনে হিচড়ে মেয়েমানুষটার কাছ থেকে ছিঁড়ে আনে অতীশকে। ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দেয় গালে। অতীশ বুঝতে পারে না অপরাধটা কোথায়। তারপর থুঃ করে একদলা থুথু ফেলে বেরিয়ে যায় মানুষটা।

সাধুটার কাছে এসে বসলে অতীশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কদিন হল লোকটা স্টেশনের কাছে এসে জমেছে। লোকজন আসে না বড়! কাজকর্ম সেরে সময় করে সাধুটার কাছে গিয়ে বসত অতীশ। নেহাতই মেয়েমানুষটার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কখন যে চোলাই গিলে কী করে বসবে ঈশ্বরও জানে না।

সাধু তাকে ধর্ম-কথা শোনাত। মাঝে মাঝে হিমালয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করত। অতীশের ভাল লাগত। সে-ও তার দুঃখের কথা, চোলাই বেচার কথা, মেয়েমানুষটার দৌরাত্মের কথা সব বলেছিল সাধুটার কাছে। নিমীলিত চোখে মাথা দুলিয়ে হাঁ হাঁ করে সব শুনে নিয়ে একদিন প্রস্তাব দিল, চল্ বেটা চল্। অতীশ তখন এক পায়ে খাড়া।

সাধু ও অতীশ কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সেই লোকালয় থেকে, যেখানে গয়া প্যাসেঞ্জার থেকে নেমে অতীশ তার ঘোলা জলের থালটাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

বেনারসে আসন গাড়ল সাধু সঙ্গে চেলা অতীশ। জপ তপ ধ্যান প্রাণায়াম কিছু না। সাধুর পা টিপে দেওয়া, উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকা, সাধুর পাশে বসে ভিক্ষে করা—এরকম সব কাজ।

সাধু তাকে একটা ল্যাঙ্‌ট্‌ দিয়ে বলেছিল, কষে বেঁধে রাখবি। বরম্‌চারী থাকলে তবে দর্শন মিলবে। শরীরে জ্বালা হলে খালি রাম নাম করবি, ব্যাস্‌ মস্তি হয়ে যাবে।

ভোরে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করা ছিল নিয়মিত। অতীশের বড় ভাল লাগত স্নানের সময়টা। সিঁড়ি ভেঙে নীচে জলের কাছে যেতে অকারণে দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। আরো অনেকে আসত স্নান করতে। একদিন সরলার মত দেখতে একটি মেয়েকে দেখে চমকে গিয়েছিল সে। এতদিন সরলার কথা মনেই পড়েনি। সে তো পালিয়ে এসেছে। কে জানে সরলার কী হল। হঠাৎ তার খুব বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে হল। সরলা নিশ্চয় ওদের বাড়ীতে নেই। ফিরে গেছে নিজেদের বাড়ীতে। কাকীমার বাপের বাড়ী সে চেনে। সোজা যদি ওখানে চলে যায়? শুধু একবার একটুখানি দেখে আবার ফিরে আসবে সে। কিন্তু জ্যাঠার কথাটা মনে পড়তে মেজাজটা বিগড়ে গেল। না, আর ফেরা নয়। সে হিমালয় চলে যাবে। খুব তপস্যা করে যদি ভগবানকে পায় তখন না হয় দেশে ফেরার কথাটা ভাববে।

সাধুর সঙ্গে বেশ চলছিল। বেনারস জায়গাটাও ভাল লেগে গিয়েছিল। মাঘ মাস পড়তে সাধু বলল, চল্‌ বেটা সঙ্গমে যাব। তিনদিন কল্পবাস করব সেখানে। কল্পবাস যে কী অতীশ বুঝতে পারল না। অবশ্য বোঝার দরকার ছিল না। তার কাজ হল গুরুজীকে অনুসরণ করা।

কোত্থেকে এক টুকরো সালু জোগাড় করল গুরুজী। হাত দুয়েক লম্বা। একটা পলকা সরু বাঁশের ডগায় আড়াআড়ি বেঁধে, শালুটায় খড়ি ঘসে ঘসে লিখে দিল 'রাম'। তারপর সেটা কাঁধে ফেলে বলল, 'নে বেটা আসন তোল্‌'। বেনারস থেকে একটানা হাঁটা পথ। দুধারে মাঘ মাসের ধু-ধু মাঠ। কনকনে হাওয়া। পথে আকাশস্পর্শী গাছ আর গাছ। মাঠের বিপুল শূন্যতায় সেই-সব গাছ থেকে অফুরন্ত পাতা পড়ছে। শুকনো বাতাসের ঝাপটায় ধুলো উড়ছে বেপরোয়া। গুরুজীর সঙ্গে অতীশ চলেছে সঙ্গমে।

হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে দিন দুই হেঁটে ত্রিবেণী সঙ্গমের

বিস্তৃত চরে এসে থামল ওরা। ঠাণ্ডায় পায়ের পাতা ফেটে চৌচির, রক্তাক্ত। গুরুজীর কথায় খানিকটা ছাই ঘসে দিয়েছে সেখানে। কাঠ জ্বালনো সাদা ছাই। তবু অবিরাম চিনচিন করত পায়ের পাতা দুটো।

সঙ্গম মানে এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল। সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে তোলা হয়েছে মাঘমাসের কল্পবাসের জন্য। হৈ-হৈ করে পাণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষ থেকে লোকজন এসেছে। চোর-ছ্যাঁচড়-বেশ্যা পকেটমারও। দোকান-পাটও বসেছে। জায়গাটা ভাল লাগল অতীশের। কেমন মেলা-মেলা। সারাক্ষণ গঙ্গা-যমুনা থেকে ছুটে আসছে রক্ত হিম করা হাওয়া।

অন্যান্য সাধুদের মত গুরুজীও একটা কুঁড়ে পেল। সাধুদের কুঁড়ে আর খরচাপাতি ভাটিয়া-গুজরাতি-মাড়োয়ারীদের। মোটা করে খড় পাতা। গুরুজী কুঁড়েতে ঢুকে ধুনি জ্বালার ব্যবস্থা করে অতীশকে বলল, নে ধুনি জ্বাল। বলেই টানটান শুয়ে পড়ল। অতীশ জ্বলন্ত ধুনিটার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকায়। আরো অনেক কুঁড়ে, কুঁড়েগুলো ছাড়িয়ে আকাশের নীচেটায় থৈ-থৈ জল, সেই জলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল উদাস একটা বিকেল নিঃশব্দে ডুবে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যে থেকে গুরুজী ঘন ঘন গাঁজা খাচ্ছে দেখে অতীশ অবাক হল। গুরুজী দিনে দুবার গাঁজা খেতেন, একবার দুপুরে, একবার শেষ রাতে। আজ কিন্তু সন্ধ্যে থেকেই চালিয়েছেন, আর মাঝে মাঝে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে কুঁড়েটাকে কাঁপিয়ে তুলছেন। অতীশ কাছে কাছে আছে। গুরুজী রক্তচক্ষু মেলে মাঝে মাঝে অতীশকে দেখছে, দেখে দেখে ধমকাবার মত করে ব্যোম্ ব্যোম্ করছেন, যেন কাউকে ভয় দেখাচ্ছেন। গুরুজীর কাণ্ড দেখে অতীশ অবাক। একসময় পদ্মাসন করে ধ্যানস্থ হলেন তিনি, কিন্তু বেশী ক্ষণ থাকলেন না, ছট্‌ফট্ করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সেই অবসরে খানিকটা আটা মেখে ধুনির আগুনে রুটি সেঁকে নিল অতীশ। গুড় আছে। রাত্রে রুটি আর গুড়। তৃষ্ণার জন্য ত্রিবেণীর জল। রুটি সেঁকা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তবু গুরুজীর

দেখা নেই। ধুনি জ্বালিয়ে একা বসে আছে অতীশ।

গুরুজী ফিরলেন বেশ দেরী করে, ফিরেই ছিলিম চড়ালেন। ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে টেনেটুনে ল্যাঙ্‌টটা ঠিক করতে করতে বললেন, রোটি দে। গুরুজীর খাওয়ার পর প্রসাদ নিল অতীশ।

চারদিকের কুঁড়েগুলোতে নিঃশব্দ অন্ধকার। মাঘ মাসের মাজা আকাশে হাজার হাজার বছরের পুরানো নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাওয়ায় ঠেলে উঠে যাচ্ছে খড় কুটো শুকনো ধুলো। গুরুজীর পাশটাতে কম্বলে শরীর ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছে অতীশ।

অসহ্য একটা চাপে ঘুম ভাঙল অতীশের। চোখ মেলে প্রথমটা বুঝল না কিছুই। ধুনির ধোঁয়া আর মরা আগুনের আলোয় ভেতরটা যেন দুর্ভেদ্য। গুরুজী তাকে অক্‌টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে। মাংসহীন শরীরের ফাঁকা গহ্বরে টেনে নিতে চাইছে তাকে। ধুনির আগুনে দেখল, বিছানার ওপর দূরে ল্যাঙট্‌টা পড়ে রয়েছে। তপ্ত শরীর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে উন্মাদ বিকার। ঘেমে উঠল অতীশ। গুরুজী দুটো হাড্ডিসার পা দিয়ে টেনে নিতে চাইছে তাকে।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল অতীশ, সঙ্গে সঙ্গে গুরুজীও। গুরুজীর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জটাজুট সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা প্রেত। ক্ষিপ্তের মত ছুটে এল অতীশের কাছে। অতীশ পাশ কাটিয়ে গেল, তারপর তুলে নিল গুরজীর চিমটেটা। গুরুজীর কোন খেয়াল নেই। গুরুজী আবার জাপটে ধরেছে। না আর দেরী না। কিছুমাত্র না ভেবে গুরজীর তলপেটে চিমটের ছুঁচোলো মুখ দিয়ে আঘাত করল সে। শব্দ করে বসে পড়ল গুরুজী, চেপে ধরল চিমটেটা। অতীশ প্রাণপনে চাপ দিল। গুরুজীর তলপেট থেকে গড়িয়ে এল সামান্য রক্ত। চিমটেটা ছেড়ে এবার লাফিয়ে পড়ল গুরুজীর ওপর। দুহাত দিয়ে চেপে ধরল গুরুজীর জীর্ণ বৃদ্ধ কণ্ঠনালীটা। চাপ দিল গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আঁ-আঁ করে অতীশকে ঠেলে দিতে চাইল গুরুজী, কিন্তু অনাহারে অর্ধাহারে ভারতবর্ষের পথে পথে ঘুরে লোকটা যেমন শ্রীহীন হয়ে পড়ে-

ছিল তেমনি শক্তিহীনও।

গুরুজীর স্থির শীতল শরীরটার দিকে তাকিয়ে অতীশের মনে হল লোকটা বোধ হয় মরে গেছে। সত্যিই মরে গেছে কিনা জানা দরকার। ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরল অতীশ, বুকের খানিকটা লোম চড়চড় করে পুড়ে বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুল। গুরুজী স্থির, শীতল।

অতীশের শরীরটা হঠাৎ ভয়ে অসাড়। আর সেই মুহূর্তে কেউ যেন তাকে ঠেলে কুঁড়েটার বাইরে নিয়ে এল। উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে শীতে কেঁপে উঠল সে। তাকিয়ে কুঁড়েটাকে দেখল একবার তারপর কল্পবাসের দ্বিতীয় রাত্রেই ত্যাগ করল এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম।

সুতরাং অতীশ ভাবতে থাকল, ওর আসল নাম, যেটা ওর মা-বাবার দেওয়া, কী ছিল সেটা? সে নামে এখন আর কেউ কোথাও নেই। গুরুজীকে হত্যা করার পর সে নতুন নামে কলকাতার পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। নতুন করে জন্ম নিল এই অতীশ। কলকাতার স্তন্যে-বিষ্ঠায়-হুতাশে-মিছিলে-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে-বেশ্যালয়ে-হকারীতে পাক খেতে খেতে এখন সে এ্যাসিস্টণ্ট ফোরম্যান। অবিবাহিত। রোজ পাতলা হচ্ছে মাথার চুল। খুব দামী ব্লেডে কামিয়েও লুকোতে পারছে না চেয়ালের গোঁয়ার পাকা দাড়ি। অতীশ চিত হয়ে এইসব ভাবতে থাকল, ভাবতে ভাবতে আবিষ্কার করল এসবের নামই সম্ভবত জীবন।

উঁচু-নিচু

আই কানট্ স্ট্যাণ্ড দিজ সো কলড্ মডার্ণ পোয়েটস্।

অমিতাভ সেন বো করার ভঙ্গীতে মিহিরের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে কথাটা বলল। মিহির চেয়ারে বসে আছে। অমিতাভ সেন দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ অমিতাভ সেনও বসেছিল। চৌকিতে। চৌকি আর মিহিরের মধ্যিখানে সানমাইকা-টপ একটা টেবিল। টেবিলটা কেন সানমাইকা-টপ ভাবতে হয়। চৌকির অন্তিম পায়ার কাছে ঘরের একমাত্র দরজা।

আই কানট্। অমিতাভ সেন কথাটা দ্বিতীয়বার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মিহিরের সামনে রয়েছে ওর নিজের কবিতার খোলা খাতা। টেবিলে গোণাগুণতি পাঁচটা গ্লাস। ঘরে মিহির আর অমিতাভ সেন ছাড়াও রয়েছে আরো তিনজন। দুজন চৌকিতে শুয়ে বসে। অন্যজন মিহিরের পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে। সিগারেট মুড়ি চানাচুর নিয়ে সবে ফিরেছে।

গ্লাসে একটু আগে ওল্ড-মংক ও ঘষা এলুমিনিয়ামের কেটলি থেকে জল ঢালা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় দফা। একটা গ্লাস ফাঁকা। শুধু চারটেতে ড্রিংক। ফাঁকা গ্লাসটা অমিতাভ সেনের।

মিহিরবাবু, আই টেল ইউ আই কানট্।

মিহির এবার বড় বড় চোখে ওকে তাকায়। গত দুদিন মিহিরের দাড়ি কাটা হয়নি। ফলে চিবুকের একাংশ সাদা। জুলফিরও প্রায় তিনভাগের দুভাগ। অমিতাভের ব্যাপারটা ওর কাছে অসম্ভব ও অলীক ঠেকছে। কবিতা ভাল লাগা না-লাগাটা নেহাৎই মামুলি ব্যাপার। আজকের এই আড্ডাটা সাদামাটা আড্ডা ছাড়া অন্য কিছু না। স্ট্রিপটিজ থেকে কবিতা সবই আলোচ্য কিন্তু অশ্লীল আক্রমণাত্মক ঘটনার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

প্রথম দফায় গ্লাসে দু পেগের মত ঢালা হয়েছিল। তাতেই? মিহির ভাবল। তারপর অমিতাভর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে জানলার বাইরে তাকায়। লোহার শিকের খাঁজে খাঁজে আটকে যাওয়া আকাশ,

আকাশে জ্যৈষ্ঠ-শেষের কালো মেঘের বড় বড় টুকরো। মিহিরের চেতনা থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল অমিতাভ। সে তন্ময় তাকিয়ে আছে।

অমিতাভ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি। পোশাক খুব ক্যাজুয়েল। পাঞ্জাবির বাঁ কাঁধটা পুট থেকে অনেকটা নেমে ঝুলে রয়েছে। পকেটে ভারী মানিব্যাগ। অমিতাভ যেন এই ফ্রিজ হয়ে যাওয়া আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছে। একটু উসখুস করে মিহিরকে কর্কশ চেঁচিয়ে বলল, তবে আপনার জরুরীঅবস্হা নিয়ে কবিতাটা, আই লাইক ইট। উড ইউ নট সাপ্লাই মি দ্যাট ওয়ান? দুটো পয়সা কামানো যাবে ওটা ভাঙিয়ে। দো মডার্ণ পোয়েটস আর অফুল।

মিহির জানলা থেকে অন্য চারজনের ভেতর ফিরে এল এবার। দূর শালা, এক রাউণ্ডেই বিগড়ে গেলি? কে তোর কাছে কবিতার সার্টিফিকেট চেয়েছে রে। লিখিস তো বিজ্ঞাপন—অমিতাভ বোধহয় একটা লাফ দিত, ভঙ্গীটা সেইরকম করে বলে উঠল, আমার একটা শব্দের দাম মিনিমাম ৩৫ টাকা—থারটিফাইভ রুপিজ। জেনে রাখুন।

কোন শালা ও সব জানতে চায়? সি আই এ'র এজেণ্টও হয়ত ডট্, মানে এক ফোঁটা কন্‌সেনট্রেটেড গোপন খবরের জন্যে দশ হাজার টাকা পায়, আমার তাতে কি?

অমিতাভ ধুপ করে চৌকিতে বসে পড়ল। ডান হাতটা তুলল, একটু নেড়ে বলল, আমি কবিতা বুঝি না? অনেকের কবিতা আমি কারেকসান করে দিয়েছি যারা এখন স্বনামধন্য, ছন্দ শিখিয়েছি, আই মীন, এখন যা লেখা হচ্ছে তাকে আপনি কবিতা বলবেন?

তবে কি বলব রে বিজ্ঞাপন-লেখক? বিজ্ঞাপন যে না সেটা তো নিশ্চিত। মিহির এখন কঠিন। এতটুকু জমি ছাড়বে না সে। অমিতাভর নেশা ছুটিয়ে দেবে।

অমিতাভ একটুও ঘাবড়ালো না বটে কিন্তু অসাবধানে একটা ভুল করে বসল। মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিশ্চয় পল ভেলেরি পড়েছেন। আপনার কি মনে হয় না—

অমিতাভকে থামিয়ে দিয়ে মিহির চাপা গর্জনে বলল, পল ভেলেরি? কবিতা লেখা শিখিয়ে দেব ওকে। আমায় পল ভেলেরি দেখাচ্ছিস? গোটা ইউরোপকে এখন কবিতা লেখা শেখাতে পারি আমরা। কথা শেষ করে কিছুটা চানাচুর মুখে পুরে দেয় মিহির। ওর চানাচুর চিবোনো দেখে ক্রোধের একটা আন্দাজ পাচ্ছে সবাই। চোয়ালের হাড় উদ্ধত সবল হয়ে উঠছে বারবার।

মনে হলো অমিতাভ একটু থমকেছে। মিহিরকে বোঝাবার ভঙ্গীতে বলল, এটা তো মানবেন, এখন সব কবিতাই একজনের লেখা মনে হয়? আলাদা কোনো চেহারা বেরিয়ে আসে না।

কথা কেড়ে নিয়ে মিহির বলল, সব রক্তপাতই এক, মেটমেটে। কিন্তু রক্তপাতে হৃদপিণ্ডের যে যন্ত্রণা, তোর মত বিজ্ঞাপন-লেখক কি বুঝবে রে? কোন কম্পানিতে যেন বিজ্ঞাপন লিখিস?

অমিতাভ ভয়ংকর আহত হল। এটা কিন্তু পার্সন্যাল এট্যাক।

কবিদের তুই হিজড়ে মনে করিস নাকি? বিজ্ঞাপনে ল্যাংটো মেয়েছেলেঁদের ছবির নিচে যদেচ্ছ লিখিস বলে ভেবেছিস যা খুশী করাটা এখন তোদের এক্তিয়ারে?

আপনার অনেক আগে আমার কবিতার বই বার হয়।

ওসব হল বিয়ের জন্যে মেয়েদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার মত। কিছু ছাপাছুপি না থাকলে যে বিজ্ঞাপন-অফিসে চাকরিটি হয় না! ছাড় তোর কবিতা লেখা।

অমিতাভ সেন চশমাটা খুলে হাতে নিল। উঠে দাঁড়াল! আমাকে একটা ক্যাব ধরে দেবে কেউ। মিহিরের পিঠের কাছে দাঁড়ানো অল্পবয়সী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। মিহির বলল, যা, ওকে একটা ট্যাকসি ধরে দিয়ে আয়। বেরিয়ে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল অমিতাভ। আজকের ড্রিংকে আমি কিছু কনট্রিবিউট করব? মিহির চেয়ার থেকে উঠে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল অমিতাভকে বার করে দিয়ে।

অসম্ভব তেষ্টায় মিহিরের ঘুম ভাঙে। ক্লান্তি ও আচ্ছন্নতার জন্যে কিছু বুঝতে পারল না প্রথমে। এত তেষ্টা কেন? চিনচিন

একটা শব্দও যেন বহুদূর থেকে কানে এসে লাগছে। শব্দ কেন? এই শব্দে মিহিরের আচ্ছন্নতা আচমকা কাটতে থাকে। কান খাড়া করে বুঝতে চাইছে শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। মিহির বিছানায় উঠে বসে।

মেঝেয় অসংখ্য পোড়া সিগারেট, মুড়ি-চানাচুর, খালি তিন চারটে বোতল, কাত হয়ে থাকা কেটলি, ঠোঙার ছেঁড়া কাগজ, বাসের টিকিট আরো যা-তা পড়ে বিশ্রী নোংরা হয়ে আছে। বিছানার চাদর অনেকটা খাট থেকে ঝুলছে। একটা বালিশ খাটের পায়ার কাছে। হাত দিয়ে চোখ কচলে মিহির খাট থেকে নামল। কুঁজোটা নেড়ে দেখল, ফাঁকা। এবার বাথরুমে ঢুকল জল খেতে। বাথরুম থেকে বাইরে এসে ঘড়ি দেখল। রাত দুটো। ঘরের অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছে। মাথাটা টিপটিপ করছে—বাতি নিভিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতেই আবার চিনচিন শব্দটা কানে এল। উৎকর্ণ হল মিহির। শব্দটা অস্পষ্ট কিন্তু কোত্থেকে আসছে? বেশ কিছুক্ষণ একাগ্র হয়ে থাকল। হঠাৎ হাসি পেল ওর। এই ব্যাপার! শব্দটা ওরই বুকের ভেতরে—জমাট শেলষ্মা বয়সের জানান দিচ্ছে। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ক্যালেণ্ডারে আছড়ে পড়ল। মিহির ঘুমোবার চেষ্টা করল। বাইরে মেঘ হয়েছে।

ঘুম আসছে না। আজকাল মাঝে মাঝেই এরকমটা হচ্ছে। আগে মাঝরাতে ঘুম ভাঙলেও নেশার দাপট থাকত পুরোপুরি। সুতরাং জেগে থাকতে হত না। কিন্তু এখন হচ্ছে। মিহির এপাশ ওপাশ করছে। যেটুকু তন্দ্রা চোখে লেগে ছিল তাও গেল। সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। বৃষ্টি হবে? বুঝতে পারছে না। ঘুম না এলে বড় বিরক্তিকর। ঘরদোর অসহ্য লাগে। ঘরদোর? মিহিরের আবার হাসি পেল। এটাকে কি ঘর বলা যায়? সুমিতা চলে যাবার পর সে এটাকে ঘর বলে না, বলে ঘরানা। ওর নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে রচিত। সুমিতা ওর স্ত্রী ছিল একদিন, একদিন না বহুদিন। আবার ওর স্ত্রীও না বহুদিন। শুধু টেলিফোন-গার্ল এখন। ডে-ডিউটি করে নাইট-ডিউটি করে। ওদের মেয়েটা এখন কোথায়?

বাপি, এখন আমি কোথায় থাকি বল ত ? পাহাড়ে, দার্জিলিং-এ। এখানে স্কুলে পড়ি।

কোন ক্লাসে পড়িস এখন ?

তুমিই বল না কোন ক্লাসে পড়ি ?

আমি তো জানি না মণি।

তবু আন্দাজ করেই বল না ?

আট বছর আগে যেন কোন ক্লাসে পড়তিস ?

ক্লাস টু-তে।

এখন তাহলে ক্লাস টেন-এ। বাঃ অনেক বড় হয়ে গেছিস তুই ! তুমিও তো অনেক বুড়ো হয়ে গেছ। কি রকম টাক পড়েছে মাথায়। চোখের নিচে চামড়া কুঁচকে গেছে।

একটুও বুড়ো হই নি।

মিহির বুড়ো হয়নি। সীমা একদিন হলুদ পাঞ্জাবি, বাদামী সুতোর চিকনের কাজ, ওটা উপহার দেবার সময় বলেছিল, কে তোমায় বুড়ো বলে ? আজ এটা পোরো, যখন কবিতা পড়বে— সবাই কি বলে দেখো।

তুই থাকবি না সীমা আমি যখন কবিতা পড়ব ?

তুমি তো জানই কবিতা আমি বুঝি না।

তাহলেও থাকিস।

না বাবা, শেষে হাই-টাই উঠলে খুব অভদ্রতা হবে। কী ভাববে সবাই ?

তুই তো আমার জন্যে থাকবি, অন্যের ভাবনায় তোর কি আসে যায় ?

সীমা ওর ছাত্রী ছিল একদা। এখন আর ছাত্রী না। অন্য একটা সম্পর্ক। ও জানে না এই সম্পর্কের কি নাম দেওয়া যায়।

এরকম টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে আসতে থাকে। ধারাবাহিক কিছু না। ইতস্তত। অথচ নিদারুণ বিদ্ধ করে। রাত্রে যখন ঘুম আসছে না, অগোছালো ঘরে কেউ নেই, একা, তখন মানুষ যে কি চায় মিহির আজও বুঝে উঠতে পারেনি। সে নিজেই নিজের

বাধন এক এক করে ছিঁড়েছে—কেউই ওর সঙ্গে থাকতে পারল না।

রোজ তোমার মদ খাওয়া আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আজকাল তুমি বদ্ধ মাতাল হয়ে বাড়ী ফের।

ফিরি। তুমিও খাও না কেন?

নোংরা কথা বলবে না।

নোংরা কেন? মদ কি মেয়েরা খায় না?

তোমার সঙ্গে এই নিষুতি রাতে তর্ক করতে চাই না আমি। আস্তে কথা বল আশেপাশে মানুষ বাস করে।

তাতে কি? ওরা কি কথা বলে না? পৃথিবীতে আমি আর তুমি ছাড়া সবাই বুঝি বোবা?

কেউ তোমার মত মাতাল হয়ে রাতে চেঁচামেচি করে না।

করে না? তার মানে করার দম নেই। সবাই ফুঃ, ফুরিয়ে গেছে। শুধু তুমি আমি অফুরান।

কথা বলতে বলতে সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে। ভাবল সুমিতার ঠোঁটে একটা চুমু খাবে কিন্তু তার আগেই বমি করে ফেলল। সুমিতার গা গুলিয়ে উঠল বমির গন্ধে। মিহির তোয়াক্কা করল না। যেন কিছুই হয় নি। সুমিতার কাঁধে মাথাটা রেখে চোখ বুজল। তারপর আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বুঝতে পারল সুমিতার দেহ ধরে ধরে নিচে পিছলে যাচ্ছে সে। মেঝেয় নেমে যাচ্ছে। সুমিতা মেয়েটাকে নিয়ে তার পরদিনই চলে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে ছোট একটা চিরকুট পেয়েছিল মিহির টেবিলে। সুমিতার।

ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল মিহির। চোখ মেলল বেশ বেলায়। রোদ এসে পড়েছে মার ছবিতে। ছবিটা এবছরই হলুদ হতে শুরু করেছে। গত বছর অবধি বেশ ঝকঝকে ছিল। হলুদ কি মৃত্যুর রঙ? মা কবেই মরে গেছে। এখন মনে হয় হাজার বছর। বেশ হত মা যদি থাকত। মা ওকে ছাড়ত না মদ খাক আর যাই করুক। বেস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করত। পুঁথি পড়ত। 'দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ—'।

নাহ্, উঠতে হয়। ঘরের যা চেহারা হয়ে রয়েছে! একটু গোছ-গাছ করা দরকার। তার আগে এক কাপ চা। হিটার জ্বালতে আলিস্যি হচ্ছে। সুতরাং মোড়ে যেতে হবে। সিগারেটও নেই। দূর শালা! প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টটা পরেই বেরিয়ে পড়ি—মোড় থেকে অফিস চলে যাব। এখন ক'টা? হাতঘড়িটা খুঁজছে। তাকেই রয়েছে। প্রায় ন'টা। মুখটা ধুয়ে মিহির বেরিয়ে পড়ল। ঘর তেমনিই পড়ে রইল। আজ দুমাস ঘর এমনিই পড়ে থাকছে। আগে সীমা এসে একটা বিহিত করত—দুমাস সীমা কলকাতায় নেই। ভুটানে। একটাও চিঠি দেয়নি। পকেটে হাত দিল। না, সিগারেট নেই।

মিহিরকে এক একদিন এক একটাতে পায়। আজ মার ছবিতে পেয়েছে। সে ভাবছে মার একটা বিরাট অয়েল-পেণ্টিং করাবে। আর কোনো ছবি রাখবে না ঘরে। ক্যালেণ্ডারও না। শুধু মা থাকবে। মা আর মিহির। ঘরে যত আসবাবপত্র বই-টই আছে সব বেচে দিয়ে ঘরটা একদম ফাঁকা করে ফেললে কেমন হয়? দারুন। মিহির মনে মনে উত্তেজিত। নতুন কিছু একটা পাওয়া গেল।

কটা কবিতার বই ছাপালে হে মিহির?

আপনি মশাই কবিতার কি বোঝেন? লেজার টুকছেন টুকুন না।

আহা, বলই না। তিনটে না চারটে?

চারটে।

কত দেনা হল?

চার হাজার।

তোমার অবশ্য ভাবনা কি? একা লোক—মেয়েটাও তো মার কাছে—তাই না?

সবই তো জানেন? রোজ রোজ খোঁচাখুঁচি করেন কেন বলুন তো?

না, না, খোঁচাখুঁচি করব কেন? খবরাখবর নেওয়াটাও কি কবিরা পছন্দ করে না নাকি?

আমি তো মশাই জিজ্ঞেস করি না আপনার মেয়ে কার সঙ্গে

রগড়ারগাড় করছে—দুপুরে আপনি যখন থাকেন না আপনার বউ—

শাট আপ্। ভদ্রলোকের ছেলের মত কথা বলতে শেখো।

আশেপাশের টেবিল থেকে সাবই মুখ বাড়িয়েছে। কিছু এখনো জিজ্ঞেস করছে না। করব করব করছে। দেরী না করে মিহির ঝট করে উঠে দাঁড়ায় তারপর বেরিয়ে যায়। সে জানে এবার যা শুরু হবে সবই ওর ব্যক্তিগত জীবনকে ইঙ্গিত করে। ওর জীবন? অর্থাৎ জীবন? আশ্চর্য এই জীবন শব্দটা। মানে বেঁচে থাকা। রোজ, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। মিহির না-মিহির হয়ে যাওয়াটাই মৃত্যু। ঈশ্বরও জানে না মৃত্যু কী ভীষণ, কারণ ঈশ্বর অমর। যে মরে গেছে সে-ও জানেনা মৃত্যু কত নিদারুণ। শুধু এই জীবিত মানুষ—মিহির—মিহির—মিহির জানে মৃত্যু কী। এই কৃপণ জীবনকেই তো ধরে রাখতে চাইছে মিহির।

নিশ্চয়, কবিতাই হল আমার জীবন।

আমরা বুঝি কেউ না? সীমা জিজ্ঞেস করল।

জানি না তোরা আমার কে। তবে একদিন বউকে মনে হয়েছিল কবিতার শত্রু। ছিঁড়ে ফেলেছি। মেয়েটাকে জানি না। সে তখন ছোট মা যখন ওকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

কিন্তু কবিতা লেখাটা কি একমাত্র সংজ্ঞা হতে পারে জীবনের?

পারে। কবিতাই কারো কারো কাছে জীবনের একমাত্র সংজ্ঞা হয়ে ওঠে। আর কিছু না। তোরা শুধু বেঁচেই থাকিস, কবিরা মৃত্যুকে তাড়া করে। বড় নিঃসঙ্গ, বড় একক এই জীবনযাপন। সে আজীবন খুঁজে বেড়ায় মৃত্যুর সব থেকে স্পর্শকাতর জায়গাটি—সেখানেই দিতে হবে চূড়ান্ত ঘা, তাই কবি আর মৃত্যু বড় নিকটতম প্রতিবেশী।

আর আমরা? মানে আমি? তোমার সীমা?

তোরা? মিহির হেসে বলল, তোরা হচ্ছিস আমার শিবিরে মৃত্যুর গুপ্তচর। খবর পেঁাছে দিস মৃত্যুকে।

বড্ড কবিতার মত করে কথা বল তুমি। ন্যাকা ন্যাকা লাগে।

ন্যাকা, ন্যাকা ? তা বটে। মাল খাওয়াবি সীমা ?

খাবে ? চল।

কোথায় ?

অম্বরে।

টাকা আছে তো ?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

চোখ বুজে আসছে। টেনেও খুলে রাখতে পারছে না মিহির। সীমার বুকে মাথা রেখেছে। সীমা সামান্য খেয়েছে, যাতে বাড়ীতে টের না পায়।

এখন বাড়ী যাবে তো ? সীমা জিজ্ঞেস করে।

বাড়ী ? সবে তো সন্ধে। ভাঙা ভাঙা গলা মিহিরের।

ন'টা বেজে গেছে।

আর একটু পরে আমায় বাড়ী নামিয়ে দিস। এখন একটু ট্যাকসিতে ঘুরি না কেন ?

বেশীক্ষণ না।

মিহির সীমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের কাছে মুখ এনে বলল, না, না, বেশীক্ষণ কেন ? তোকে আমি বেশীক্ষণ সইতেই পারব না। তুই আমাকে জ্বালিয়ে দিস, মনে পড়তে থাকে আমারও একদিন তোর মত তাজা একটা শরীর ছিল, তখন কেন তোকে পেলাম না ? তোকে আমি খুন করব সীমা।

আহ্, চুপ কর তো ! একটুতেই তোমার নেশা হয়ে যায়।

মিহির কোনো জবাব দিল না। কেন জবাব দিচ্ছে না, নাকি দিতে পারছে না—সীমার কোনো কৌতূহল হল না জানতে।

সম্পর্ক

আমি একটা নতুন নাম দেব তোমায়।

কেন, আমার কি নাম নেই নাকি?

ওতে আমার চলবে না।

আমার অনেক নাম। মুন্না, বিদিশা, লাবণ্য, চুমকি। সবাই আমাকে ক-ত নামে ডাকে।

আর একটা হবে, বেশী আর কি?

তুমিও অন্য সবাইর মত দেখছি।

সবাই সবাইরই মত। মিছিমিছি আলাদা ভাবি। ওসব ছেঁদো ব্যাপার।

কথা বানাতে ওস্তাদ তুমি।

শুভেন্দু ও দীপা ঘাসে বসেছিল। এখানে বসতে ওদের ভালো লাগে। জায়গাটা ভীড় থেকে একটু দূরে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে। শুভেন্দু চল্লিশের কাছাকাছি। দীপাকে ওর সঙ্গে পিতা-পুত্রীর মত মনে হয়। দীপার বয়স বাইশ ছাড়ায় নি।

দীপার কাঁধে থাকে ঝোলানো ঝোলা। সুতোর কাজ তাতে। সূর্যমুখি নয় তো অন্য হালকা নক্‌শা। শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজ। কপালের টিপ থেকে জুতো অবধি সবই মানানসই। গো-গো ধরনের রোদ-চশমাটা বেশীরভাগ সময় হাতে থাকে, কমই চোখে ওঠে।

শুভেন্দুর কোনো হৈ-চৈ নেই পোশাকে। দাড়িটি কাটে নিয়মিত। আপিস বেরুবার সময় কিছুটা আফটার-শেভ লোশন লাগায় ঘাড়ে-গলায়। গন্ধটা বিকেল অবধি থাকে না। এই বিলাসিতাটুকু দীপার জন্যে।

দীপার দিকে তাকালে সবাই বলবে চমৎকার। ওর মুখটা নিষ্পাপ মনে হয় সদা-সর্বদা। চোখ দুটো স্বাভাবিকের তুলনায় বড়ই। নিশ্চিন্ত নির্ভয় চলাফেরা, সেটা বোধ হয় ওর রোগাটে শরীরের জন্যেই। শুভেন্দু ওকে এড়াতে পারে নি এবং ভাবে এড়ানো

সম্ভব নয়।

দু জনের সম্পর্কের মধ্যে একটা মূল্যবোধের ব্যাপার রয়েছে—তা হল বিশ্বাস। দীপা একদিন ঘাসে বসেই বলেছিল, শুভদা তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই বলে। কথাটার আসলে যে কি অর্থ শুভেন্দু ভেবে পায় না। 'বিশ্বাস?' সেভাবে, কথাটার অন্তর্গত মানেটা কি? বাবা বা দাদুর সঙ্গে এক বিছানায় যে বিশ্বাস নিয়ে যুবতী মেয়ে ঘুমোতে যায় তেমন কি? কিম্বা মার সামনে ব্রা পালটানোর মত কিছু?

ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিল দীপা। থুঃ করে ওটা ফেলে দিয়ে শুভেন্দুকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ? নাম বললে না?

শুভেন্দুর ভাবনা গুলিয়ে গেল। নাম দেবার কথায় ফিরে এল সে। দীপার স্বভাবে নেই চুপচাপ থাকা। অন্যকেও থাকতে দেয় না।

কি নাম দিই বল তো!

দীপা আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকায়, বারে আমি কি বলব, ব্যাপারটা তো তোমার।

তাহলে, আজ থাক, অন্যদিন হবে।

দু হাত ঝাঁকিয়ে ধড়পড় করে উঠল দীপা, না, না এক্ষুণি নাম বলতে হবে, এক্ষুণি, এক্ষুণি।

মোটেই এক্ষুণি না, কাল ভেবে নিয়ে বলব।

অভিমানে একটু সরিয়ে নেয় নিজেকে। সূর্যমুখি আঁকা ঝোলাটা ঘাস থেকে কোলে তুলে স্থির তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। রোদ-চশমাটা চোখে দেয়। বাঁ হাতে টেনে টেনে ছিঁড়তে থাকে ঘাস।

দীপাকে আর একটু ক্ষ্যাপাবার ইচ্ছে হল শুভেন্দুর। বলল, কমল তোমাকে দীপা বলেই ডাকত, না, নতুন নাম দিয়েছিল? কথাটা শেষ হয়েছে সবে, তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপা। চশমাটা চোখ থেকে খুলে মুঠোয় চেপে বলল, বাড়ি যাব।

কেন?—শুভেন্দু বসে বসেই জিজ্ঞেস করল।

ভাল লাগছে না।

আর একটু বোসো। ভাল লাগবে।

একটুও বসব না। তোমার ইচ্ছে হয় বোসো। আমি চলি।

অন্তত দু মিনিট।

এক মিনিটও না।

অগত্যা শুভেন্দু উঠে দাঁড়ায়। দীপার চোখ মুখ রাঙা। এক্ষুণি জল গড়িয়ে পড়তে পারে চোখ দিয়ে। সাধারণত কমলের কথায় দীপা কিছু মনে করে না। সম্পর্ক একটা ছিল, এখন তা চুকে-বুকে গেছে। শুভেন্দুকে দীপাই কথাটা বলেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য কমলের কথা ওঠে। দীপার রাগ হয়, বলে, ও ভাবে কি? ফুঃ, ওরকম হাজারটা বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করা যায়। আবার কোনো কোনো দিন একটু অন্যরকম গলায় হয়ত বলে, কমলকে বাসে দেখলাম কি যাচ্ছেতাই রোগা হয়ে গেছে। হবে না। কে ওর খোঁজ নেয়? বাড়ির লোকগুলোও যা-তা।

শুভেন্দু শোনে। ভাবে। দীপা কি শুভেন্দুর মধ্যে কমলকে খোঁজে? কমলের কথা বলে শুভেন্দুর ভেতরটা নাড়া দিতে চায়? নাকি কমল আর শুভেন্দুকে মিলিয়ে মিশ্রিত জটিল কোনো পুরুষ ওর কাম্য? তা সম্ভব হচ্ছে না বলেই ওর যন্ত্রণা। উড়নচণ্ডীর মত ঘুরে বেড়ানো?

হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম স্টপেজে আসে ওরা। ইতিমধ্যেই বদলে গেছে দীপা। অনেকটা নিচে নামিয়ে নাকে বসিয়ে দিয়েছে চশমাটা। চুলে হাত চালিয়েছে। শরীরে পারফিউমের গন্ধ। শুভেন্দু পাশে পাশে চুপচাপ হেঁটে এসেছে। দীপাই স্টপেজে দাঁড়িয়ে কথা বলল,

তুমি কোনোদিন আর কমলের নাম নেবে না শুভদা।

নেব না। শুভেন্দু বলল।

দীপা যে বছর ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রী সে বছরই কমলের সঙ্গে যা কিছু সবই চুকে যায়। আর সে-বছরই প্রথম পাল্লায় পড়ে মদ খেয়েছিল দু একবার। জিন উইথ লাইম। ড্রিংক নিয়ে বহুদিন থেকেই ওর কৌতূহল। তবে অবশ্যই কিছুটা সংস্কার ছিল।

ভয়ও ছিল। মাতাল দেখলে ছোটবেলায় আর সবাইর মত সে-ও ভয় পেত। যারা মদ খায় তারা যেন কেমন অন্যরকম। মাতালদের নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। দুঃখ-টুঃখ ভোলার ব্যাপারও নাকি রয়েছে ওতে। মেয়েদের সে খুব একটা ড্রিংক করতে দেখে নি। খুব একটা কেন, দেখেই নি বলতে হয় ইউনিভার্সিটিতে আসবার আগে। মেয়েদের কি দুঃখ নেই তাহলে? মাঝে মাঝে নিজেকে খুব দুঃখি মনে হত দীপার। ওদের একটা পোষা টিয়া পাখি আছে। পাখিটির লাল কাচ-পোকার মত গোল গোল চোখের তারার দিকে তাকিয়ে এক এক দিন কেমন দুঃখ বোধ হত দীপার। ঠিক ব্যাখ্যায় আসে না—এমন দুঃখ। বেশীক্ষণ না। ড্রিংকের কোনো যুক্তি খুঁজে পায় নি তবুও।

কলেজে থেকেই সে কষ্ট পেতে শুরু করে তার রোগা শরীরের জন্যে। যেখানে যতটা দরকার, তা তার নেই। সে তখন শুনেছিল ড্রিংক করলে শরীর ভাল হয়! সামঞ্জস্য আসে। অন্য মেয়েদের মত অসংযত শাড়ি পরত না সে, গলার ওপর দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে শরীর ঢেকে রাখত। নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা যেন। তবু ছেলেরা তার দিকে তাকাত, সেটা বড় বড় চোখ দুটোর জন্যেই সম্ভবত। কমল তাকে বলেছিল, তোমার চোখ দুটো দারুণভাবে খৃষ্টীয়। পবিত্র-পবিত্র। কমলের সঙ্গে ঘনিষ্টতার জন্যেই দীপা মনে মনে সংকুচিত হচ্ছিল প্রতি দিনই। ওর শরীর গড়ে তুলেছিল ব্যবধান। দীপা তাই কমলের মনে এক ধরনের নীতিবোধ খুঁজেছিল, যা কমলকে আগ্রহান্বিত করবে না ওকে কাছে টেনে নিতে। অন্তত যদ্দিন না শরীরটা ছুঁতে দেবার মত হয়। সে গোপনে চেষ্টা করছিল সুন্দর স্বাস্থ্যের। ড্রিংক করলে স্বাস্থ্য ফেরে, এ-ধারণাটা তখনই তার মাথায় ঢোকে।

পার্কস্ট্রীটের কিঞ্চিত অভিজাত পানশালায় তরুণ প্রদীপ ও দীপা এসেছিল কিছুটা মজা করতে। শুভেন্দু আগেই ছিল সেখানে। কাকতালীয়। বসে বসে বিয়ার খাচ্ছিল। তরুণই শুধু শুভেন্দুকে চিনত। তরুণের প্রথম চাকরি শুভেন্দুর অফিসে। বেশী দিন

ছিল না অবশ্য। তখনই পরিচয়। শুভেন্দুকে দেখেও না দেখার ভান করে অন্য একটা টেবিলে বসেছিল তরুণ ও অন্য দুজন। তরুণের পিঠ শুভেন্দুর দিকে। পানশালায় নিয়ন্ত্রিত আলো। কম আলোয় দীপাকে দেখছিল শুভেন্দু। সাদা শাড়িতে ছোট-খাটো খরগোসটি যেন। কানে সাদা প্লাস্টিকের দুল, কাঁধের ঝোলাটাও সাদা। হাতে রোদ-চশমা। শুভেন্দু ভাবল সবাইকে ওর টেবিলে ডেকে নিলেই হয়। না, থাক। তরুণ ভাবতে পারে মেয়ে দেখে ব্যাপারটা সে করল।

বেয়ারা তিনজনকে গেলাস আর সোডা দিয়ে গেল। এক রাউণ্ড হয়ে যেতে তরুণ ঘাড় ঘুরিয়ে শুভেন্দুকে দেখল। আরে শুভেদা না? উঠে শুভেন্দুর কাছে এগিয়ে এল সে, চিনতে পারছ শুভেদা?

হুঁ। আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছিলি, তাই না?

তোমার সামনে এই প্রথম কিনা, তাই একটু ওই যা বলছিলে—সত্যি পাচ্ছিলাম।

এখন বুঝি পাচ্ছিস না?

এক রাউণ্ডের পর ওসবের মানে দাঁড়ায় না। চল, আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে।

তরুণ বলতে গেলে একরকম টেনেই শুভেন্দুকে ওদের টেবিলে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল আর দুজনের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করল, বিয়ারই তো খাবে?

শুভেন্দু তাকিয়েছিল দীপার দিকে—সেখানে খুব একটা প্রসন্নতা ছিল না। শুভেন্দুকে দেখে দীপা খুশি হয় নি।

শুভেন্দুর জন্যে বিয়ার এল। তরুণ একাই শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলছে। দীপা চুপচাপ। নিশ্চয় বিরক্ত। পাশের প্রদীপকে এক ফাঁকে কানে কানে বলল, ধেড়েটাকে যে কেন পাকড়ালো কে জানে। কথাটা শুভেন্দুর কানে এসেছিল। বিয়ারের প্রভাবেই হবে, এক ধরনের জিদ অনুভব করল শুভেন্দু। সে দীপার দিকেই প্রায় সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকল। অথচ একটু আগে ভেবেছিল উঠে অন্য টেবিলে গিয়ে বসবে। এমন এক অস্বস্তিকর প্রতিকূলতার মধ্যে শুভেন্দুর সঙ্গে দীপার পরিচয় হয়েছিল। তারপর সেই

পরিচয় নানা খাত বয়ে ঘনিষ্টতায় এসে দাঁড়ায়।

রাত্রের ক্লাস দীপার। মাঝে মাঝে চৌরঙ্গিতে নেমে বাস বদলায়। না বদলালেও চলে। সরাসরি যাবারও বাস রয়েছে। একদিন চৌরঙ্গিতে দীপার সঙ্গে শুভেন্দুর মুখোমুখি। একটু ভেবেছিল। তারপর যেচেই কথা বলেছিল শুভেন্দু। মনে হল না খুব একটা অপ্রসন্ন। বরং বেশ সুন্দর কথার জবাব দিয়েছিল।

কমলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর দীপা বোধ হয় একটু বেসামাল হচ্ছিল জীবনে। তাই শুভেন্দুকে যতটা বিরক্তিকর ঠেকেছিল প্রথম দিনে, এখন মনে হল না। শুভেন্দুর কথা বলার ঢঙ অনেকটা অন্যরকম, ভালো লেগে যায়।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে শুভেন্দুকে আশা করত চৌরঙ্গিতে —বাস বদলের সময়। ব্যাকুলতাহীন চাওয়া।

শুভেন্দুকে না দেখতে পেলে তেমন কিছু মনে হত না। দেখা হলে খানিকটা সময় গল্প করতে ইচ্ছে হত। ওই অবধিই। শুভেন্দু দীপার ধরনটা বুঝে নিয়েছিল। সে, বলতে গেলে, প্রায় রোজই এসে সময় মত দাঁড়িয়ে থাকত। বেশীর ভাগ দিনই দীপার সঙ্গে দেখা হত। মাঝে মাঝে নিজেকে হ্যাংলাও মনে হত। তখন দু তিন দিন লা-পাতা। আবার যখন দেখা হত—লক্ষ করত দীপার মুখে চাপা খুশি। গল্প করতে করতে দু একটা বাস ছেড়ে দিত এক এক দিন। ক্রমে এই দেখা-হওয়া গল্প-করার ঢিলে-ঢালা সম্পর্কটা ঘনিষ্টতর চেহারা নিয়ে ওদের দুজনকে বেশ কাছাকাছি নিয়ে এল। দীপার হয়ত ভুলেও সারাদিন শুভেন্দুকে মনে পড়ে না কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় না দেখতে পেলেই অভিমান হয়। ভেবেই বসে, শুভেন্দু আমার কে। শুভেন্দু তরুণও না কমলও না। দেখা না হলেই বরং বাঁচি।

শুভেন্দুর মনে হত ভানুমতীর খেল। সে যেন দু খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে তার বয়স অন্যদিকে দীপা। বিপরীত টানাপোড়েন। দীপার সঙ্গে সম্পর্কের কোনো শেকড় নেই অথচ

মনে হয় ব্যাপারটা অপ্রতিরোধ্য। দীপা তাকে কৈশোরের দিকে টানে, মিথ্যে করে দিতে চায় চল্লিশের বয়স্কতা।

কখনো দীপার আবদার ছুটির দিনে ব্যান্ডেল যেতে হবে। সকাল ঠিক ন'টায় হাওড়া স্টেশন। কাঁধে ঝোলা, সঙ্গে প্যাকেট-বন্দী খাবার,—শুভেন্দু এসে দাঁড়ায়। শেষ সময়ে ছুটতে ছুটতে দীপা আসে।

উহ্, কি গুলটাই দিতে হল। যাক গে, ধরা পড়লে খুব একটা শাস্তি হবে না। তোমাকে মাষ্টারমশাই বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

আর আমি যদি অন্য কথা বলে ফাঁসিয়ে দিই ?

শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে দীপা জিজ্ঞেস করে, মানে ?

কেন ? বলব আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড।

খিলখিল করে হেসে খটখট শব্দে চলতে শুরু করে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, বয়ফ্রেন্ড না ঘেঁচু। বুড়ো শেয়ালের শখ কত !

কি ? আমি শেয়াল ? ঠিক আছে, আমি থাকলাম। একাই তুমি ব্যান্ডেল যাও।

দীপা ঘুরে দাঁড়িয়ে জামার কোণা ধরে। আচ্ছা তাই, তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড।

হেসে শুভেন্দুর পিঠে কিল দেয় লোকভর্তি স্টেশনে।

ওরা বসল গীর্জার রোদে যেখানটাই ছায়া পড়েছিল। শুভেন্দুর হাঁটুতে হেলান দিয়ে গঙ্গায় চোখ রেখে একটানা কথা বলেছিল দীপা। প্যাকেটের খাবার খেল ভাগ করে। শুভেন্দুর হাত থেকে চারমিনার নিয়ে টেনেছিল একবার। কাশতে কাশতে মুখটা রগড়েছিল শুভেন্দুর হাঁটুতে।

শুভেন্দু কথা বলেছিল কম, ভেবেছিল বেশী। নির্জন ব্যান্ডেলে কেমন একটা ঐতিহাসিক শূন্যতা। দীপার গায়ে গা দিয়ে বসেও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল শুভেন্দু। দীপা অনুযোগ করছিল ওর অন্যমনস্কতায়। শুভেন্দুর থুতনি নেড়ে অভিনয়ের মত করে বলেছে, 'কত ক্ষুদ্র একটি মেয়ে অথচ তোকে আমি ঈর্ষা করি।'

শুভেন্দু অনেক কথাই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু দীপার সহজ সরল মেলামেশার তোড়ে সে কিছুই বলতে পারে নি।

ব্যাণ্ডেল থেকে ফিরে ঘণ্টা দুয়ের মত ছিল বাড়িতে। তারপর আবার চৌরঙ্গিতে ফিরে এসছিল দীপা। এরকমই কথা ছিল। চীনে রেঁস্তোরায় রাত্রের খাওয়া খেয়েছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে বেড়িয়েছিল পার্কস্ট্রীটে। খেতে খেতে হালকা গলায় দীপাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি বলতে পার?

কেন? ভালবাসার।

কথাটা এমনভাবে বলেছিল, যেন অপ্রয়োজনীয় এক টুকরো কাগজ কুটি কুটি ছিঁড়ল, তারপর হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

দুজনের মেলামেশার মধ্যে নিশ্চয় একটা শূন্যতার যন্ত্রণা ছিল এবং ক্রমেই সেটা ভারী হয়ে উঠছিল। শুভেন্দুর স্নায়ুতে চাপ দিচ্ছিল এই শূন্য। দীপার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা শুভেন্দুকে অন্যান্য বহু ব্যাপার থেকে সরিয়ে এনেছিল। আগের সুখ আর সুখের মত ছিল না। দেখা হলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে। অশ্লীল ইঙ্গিত করে। শুভেন্দু তাই এড়িয়ে চলতে চায় নিজের চেনা পরিবেশ। নিয়তির মত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল দীপার ওপর।

দীপা এর মধ্যে ফাইন্যাল ইয়ারে উঠেছে। শুভেন্দুর বয়স বেড়েছে আরো এক বছর। দীপার বন্ধুর সংখ্যা, জীবনের স্বাদ অনুপাতে বেড়েছে। এখন পাগলের মত দীপা আর রোজ রোজ দেখা করতে আসে না। তবে দেখা হয়। দেখা হলে পিকনিকের গল্প করে। দু একজন অসাধারণ বন্ধুর কথা বলতে ছাড়ে না। শুভেন্দুর ভাল লাগে না।

ঝাঁপি খুললে সাপ যেমন ফণা তুলে দাঁড়ায়, শুভেন্দুর ভেতরটা এখন সেরকম হয় মাঝে মাঝে।

সাতদিন দীপার সঙ্গে দেখা হয় নি। কি করবে বুঝতে পারে না শুভেন্দু। আটদিনের মাথায় অফিস কামাই করল। যাবে না যাবে না করেও সোজা চলে এল ইউনিভার্সিটিতে। কিছুক্ষণ আগেই

কলেজস্ট্রীটে সন্ধ্যা নেমেছে। তখনো দীপা আসে নি। শুভেন্দু অপেক্ষায় রইল। একসময় প্রায় দৌড়ে দীপা এসে ঢুকল। শুভেন্দুকে লক্ষ করে নি। ক্লাসের তাড়া, দেরি হয়ে গেছে। শুভেন্দু ডাকল। দারুণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপা।

শুভদা। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কারো সঙ্গে দেখা করবে বুঝি।

চল। কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। চা খাব।

এখন না শুভদা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ফেরার সময় চৌরঙ্গীতে খাওয়াব।

দেরী হোক গে। ক্লাস-ফ্লাস ছাড়।

যা-তা হবে তাহলে।

হোক। একটা দিন ক্লাস কাটতে পার না? ইয়ার্কি হচ্ছে?

প্লীজ আজ ছেড়ে দাও শুভদা।

কেন? অন্য কেউ অপেক্ষা করছে? তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে।

শুভেন্দু দীপার হাত চেপে ধরে। দীপার ক্লাসে যাওয়া হয় না। দু জনে চলে আসে রাস্তায়। পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। দীপা শুরুতে একটু গম্ভীর। কিন্তু ওর স্বভাবে নেই গম্ভীর থাকা। ট্যাক্সি পেয়ে শুভেন্দু ডাকে। ওরা উঠে বসে।

কোথায় চললে? দীপা জিজ্ঞেস করল উইণ্ডস্ক্রীনের কাচ নামাতে নামাতে।

অতকিছু জানার কি আছে? আমাকে বিশ্বাস করতে পার না? শুভেন্দু হাসতে হাসতে কথাটা বলল।

আজকে শুভেন্দুর ব্যক্তিত্ব যেন অন্যরকম। এমন দেখে নি দীপা। সাত দিনেই লোকটা বদলে গেল?

গঙ্গার পারে এসে ট্যাকসি ছেড়ে দিল শুভেন্দু। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ঘাটে। নৌকো নিল শুভেন্দু। দীপাকে বলল, আজ জলে বসে গল্প। শুভেন্দুর সঙ্গে এসে নৌকোয় ওঠে দীপা। কোনো কথা সে বলে নি।

নৌকো কিছুটা ভয়ের কিছুটা রোমাঞ্চের দীপার কাছে। সে

সাঁতার জানে না। রাত্রিতে নৌকোয় বসে গঙ্গাকে ভীষণ মনে হল তার। পাশে বসেছে শুভেন্দু। হ্যারিকেনের তীর্যক আলো পড়েছে পাটাতনে। ছইয়ের ভেতরটা অন্ধকার। সিগারেটের হঠাৎ হঠাৎ আভা সেই অন্ধকারে।

সাতদিন আস নি কেন? কোথায় ছিলে? শুভেন্দু মুখ খুলল।

এমনি। দেরীতে ক্লাস শেষ হয়। তাই।

আগে তো আসতে।

এখনও তো আসি শুভদা। মাঝে মাঝে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়—ফাইন্যাল ইয়ার কিনা। মিছিমিছি রাগ করছ।

রাগ করছি না। বুঝতে চাইছি। সবাই তো ছেড়েছে—তুমি কবে ছাড়বে।

শুভেন্দুর গলায় শুষ্কতার আভাস। নৌকোর দুলুনিতে গায়ে গা ঠেকছে। অন্যমনস্ক শুভেন্দু। ঘন ঘন সিগারেট টানছে। দীপা টের পাচ্ছে শুভেন্দুর উত্তেজনা। দীপা সব বুঝেই শুভেন্দুর গায়ে হেলান দিয়ে বসে। শুভদা, তুমি খুব বড় লেখক নয় তো নায়ক বা তেমন কিছু হতে পার না? সবাই তোমাকে চিনবে?

শুভেন্দু শুনে গেল কিন্তু জবাব দিল না।

তুমি তেমন কিছু হও না শুভদা।

প্রতিভাকেই বোধ হয় বয়সের আচ্ছাদন ভেবে নিয়েছে দীপা। তাহলে প্রতিভাবান শুভেন্দুর সঙ্গে গ্রহণযোগ্য একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে ওর কোনো অসুবিধে হয় না!

দীপার হাতটা তুলে নেয় শুভেন্দু। সিগারেট ছুঁড়ে দেয় জলে। ওর ঠোঁটের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। এবং হঠাৎ দীপাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে। মুহূর্তে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় দীপা, শরীরে মোচড় দেয়, না, না, শুভদা—শুভেন্দু ওর গলায় মুখটা চেপে চুমো খায়, লোভীর মত বলে, শুধু একবার, আর কোনো দিন তোমার কাছে কিছু চাইব না।

না, শুভদা। সমস্ত বিশ্বাস আমার ভেঙে দিও না। ছেড়ে দাও। লাগছে আমার। জোর করে যা নেবে তা তো মড়ার শরীর। ওতে তুমি শান্তি পাবে না।

আস্তে হাতটা আলগা হতে থাকে শুভেন্দুর। হেরে যাওয়া মানুষই এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। শুভেন্দু যা পেতে চেয়েছিল, অত সহজে সে তা পেল না। শরীরটা এলিয়ে দিল দীপার শরীরে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। দীপার বড় বড় চোখ দুটি, পাতলা দেহ-বল্লরী ঘৃণা করছে শুভেন্দুকে। থরথর করে কাঁপছে দীপার শরীর।

তুমি কি কিছুই দেবে না আমাকে? অন্তত একটা চুমুর বাড়া-বাড়ি? শুভেন্দু বলল মরীয়া গলায়। দীপা শুভেন্দুকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল। বলল, কেন? কেন তোমরা আমাকে এমন-ভাবে নষ্ট করবে? সবার সঙ্গে সহজে মিশি বলে কি রাস্তার মেয়ে আমি? কমল, অরুণ, তুমি—সবাই কি এক। কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারব না?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল দীপা।

বমি

চশমার চৌকো ফ্রেম চোখের চাইতে বেশ বড়। চৈত্রের দপদপে দুপুরে চৌরঙ্গিতে মানুষের ভিড় একটুও কম থাকে না। কোনো কোনো দিন আবার মিছিল। জায়গাটার চেহারা আন্তর্জাতিক না হলেও—আন্তঃপ্রাদেশিক তো বটেই। বাদল হাঁটছিল। চৌরঙ্গি দিয়ে। সে অবশ্য জনসংখ্যার জাত বিচারে ভাবিত ছিল না। তার লক্ষ্য খুব একান্ত একটি চেনা রেস্তোঁরা। রেস্তোঁরার কাছে এসে পেঁছিল। ঢুকল তাতে। কিছু কিছু চেয়ার খালি। বসল। রাস্তার অদূরে দাঁড়ানো উপেক্ষিত গাছটায় জীবন্ত হালকা রঙের থোকা থোকা পাতা।

আশেপাশে যারা বসেছিল সবাই বাদলের চেনা, অথচ মাত্র দু' একজনের নাম সে জানে। ছাইদানির ঢাকনা ফুঁড়ে সিগারেটের ফেলে দেওয়া অংশের আত্মপ্রকাশ দেখে মনে হল এরা অনেকক্ষণ আগেই এসেছে। সকলের চোখে মুখে দক্ষতার আশ্চর্য আভাস যা দেখলে মনে হবে না এরা এমনি এমনি বসে আছে। বাদল চেয়ারে বসতেই সবাই ওকে গ্রহণ করল আন্তরিক আমন্ত্রণে। আমন্ত্রণটা নিঃশব্দ।

বাদল অফিস পালিয়েছে। বদ অভ্যেসটায় এখন আর সুখ নেই বললেই চলে। দিনে দিনে ছোট হয়ে গেল শহরটা—চোখের সামনেই। এইটেই বোধ হয় নিয়ম এবং জীবন। বাদলের কাছে জীবনের মানেটা যেন হঠাৎ ধরা পড়ল। মনে মনে খুশী হল সে। খুশীতে চায়ের অর্ডার দিল চমৎকার উচ্চারণে, 'গোলাম, চা দে, আর জল।' 'দু কাপ' পাশে বসে থাকা গৌর জুড়ে দিল কথাটা, তারপর মুখটা বাদলের কাঁধে এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'রাগ করলে? দাও, সিগারেট নিয়ে আসি'। বাদল হেসে ফেলল, তারপর পয়সা দিল গুণে গুণে। পয়সাটা নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গৌর, 'জায়গাটা দেখো' বলে একদম চৌরঙ্গীর প্রবাহে।

গৌর বেরিয়ে যেতে অন্য চেয়ারে বসে থাকা সুজিত মুখ খুলল, 'একটু ওদিকে বসবে ? কথা আছে।' সুজিত নিজেকে আলাদা রাখে ভিড়ে। কথা বলার সময়ও তার শব্দবাছাই নিজস্ব। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছিল শেষ পরীক্ষার আগে, তার কিছুদিন পরেই বাড়ী। কলকাতা তখন দাউদাউ। দেয়ালগুলোয় রোজ নতুন নতুন লেখা, কাগজে কাগজে খুনের খতিয়ান। তারপর, সব যেমন নতুন একটা বর্তমান প্রসব ক'রে শেষ হয়ে যায়, সেই রক্তবমি করা দিনগুলোও তেমনিভাবে শেষ হল একদিন। সুজিত ঘরে ফিরেছিল একেবারে অন্যরকম হয়ে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল এই বয়স্ক লোকটার অপদার্থতার জন্যেই সে যুদ্ধটা জিততে পারেনি। এই লোকটাকে আগেই হত্যা করা উচিত ছিল। বাবা কোনো কথা না বলে চলে গিয়েছিলেন পাশের ঘরে।

সুজিত মাথা নীচু করে নিজের পুরোনো ঘরটায় এসে ঢুকেছিল বন্দী কয়েদির মত। ঘরটা বদলে গিয়েছে আগাগোড়া, ছোটবোন সীতা থাকে সে-ঘরে। ঘরটাতে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছিল না। ঢোকা কি ঠিক হয়েছে ? সে থাকবে কোথায় ?

'চা-টা খেয়ে নিই তারপর যাচ্ছি।' বাদল সুজিতের কথার জবাব দিল। সুজিত আবার বলল 'পালিয়ে যাবে না তো ? ভীষণ দরকারী কথা।'

সুজিতের রোজ একটা করে দরকারী কথা থাকে। বাদল মনযোগ দিয়ে শোনে, আর মনে মনে হাসে। নতুন নতুন সব সমস্যা, নতুন নতুন সমাধান ! নানা বই থেকে ঠুকরে নেওয়া অস্পষ্ট এলোমেলো কথাবার্তা। বাদল মাঝে মাঝে তর্ক করে, সুজিত উৎসাহিত হয়, তারপর কথার খেই ধরে একসময় হয়ত বলবে, 'জান বাদলদা আমি হেরে যাওয়ার ছেলে নই', একটু থেমে, 'ডাইলেক্‌টিক্‌স্‌ শুধু ম্যাটার নিয়ে ডিল করেছে, আমি আরো একটু এগিয়ে দেখতে চাই and that is other kind of revolution—a violence। সব শালা শুয়োরের বাচ্চা।'

বাদল সুজিতকে এড়িয়ে চলে, আর সুজিত বাদলকে ধরলে ছাড়তে চায় না। যেন ভেতরের ফুঁসে ওঠা মানুষটা কথা বলতে

চায়, যে কথাগুলো কখনো হাহাকারের মত কখনো দরিদ্র জমিদারের দম্ভের মত। বাদল ভাবে, 'এই হয়, তা না হলে কাঠামোটা টি'কে থাকবে কেন!'

সুজিতের সঙ্গে কথা বলল বাদল। চা খেলো আরো দুবার, তারপর একসময় সুজিত উঠে বাঁ কাঁধটা ঠেলে উ'চু করে পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল চৌরঙ্গীর ভিড়ে।

বাদল খেয়াল করেনি কখন ঊর্মি এসে চুপচাপ বসে আছে। কলেজ থেকে ফিরেছে। সুজিত উঠে যেতেই ঊর্মি বাদলের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাদল ওকে দেখে খুশী হল, বলল,

কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন? কপালের টিপ থেকে পায়ের জুতো অবধি দারুণ দেখাচ্ছে।

কি খাওয়াবে বল, তাহলে বলছি!

যদি এক্ষুনি এই মুহূর্তে খেতে চাও তাহলে হাতের কাছে সিগারেট আছে, খেতে পারো—আর যদি সময় দাও তাহলে যা খাবে তাই খাওয়াব।

বাস্ রে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছ দেখছি?

বড়লোক না, একেই আমরা শিভাল্‌রি বলি।

ঈস্, বলিস না, বলিস না—

বলতে বলতে হেসে বসে পড়ল ঊর্মি। অন্য চেয়ার থেকে ওদের দুজনের দিকে তাকাল চেনা মুখগুলো আর তাতেই চনমনিয়ে উঠল ঊর্মি। পোশাকের কম্‌বিনেশানটা তাহলে লক্ষ ভেদ করেছে।

কলকাতার চৈত্রমাস তেতে তেতো হয়ে যায় বিকেলগুলোতে। অফিস আদালত ছুটি হয়ে গেছে। চৌরঙ্গীর ভিড় ঠাসাঠাসি হতে হতে গে'জিয়ে উঠেছে বাইরে। ঊর্মি আর বাদল কফি নিয়ে গল্প করছিল, আর মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল এমনিই। সেখান থেকে কখন হঠাৎ উঠে এল বাদলের বন্ধু রবি। অফিস ফেরত। ঊর্মি'ই রবিকে প্রথম দেখতে পেল 'তোমার বন্ধু আসছে', বাদলকে বলেছিল। ধুতি পাঞ্জাবি আর মুখে হাসি নিয়ে রবি পরম নির্ভরতায় এগিয়ে এল ওদের দিকে। প্রথমে সম্বোধন করল

ঊর্মিকে 'কেমন আছেন দিদি?' যে কোনো বয়সের অনাত্মীয়া মেয়েকে দিদি বলবে রবি, ঊর্মিকেও বলে। ঊর্মি মাথা হেলিয়ে জবাব দিল, কিন্তু শব্দ করল না। বাদল রবিকে দেখে মনে মনে বিরক্ত। ঠিক এই মুহূর্তে সে তৃতীয় কাউকে আশা করেনি টেবিলে—কারণ ঊর্মি তো বেশীক্ষণ থাকবে না। কোনদিনই বেশীক্ষণ থাকে না। আসে, খানিকটা গল্প করে তারপর চলে যায়। সুতরাং ঊর্মির সঙ্গে থাকার সময়টুকু বাদল স্বার্থপর। অথচ ঊর্মির সঙ্গে বাদলের যে কোনোকিছু সম্পর্ক আছে, তাও না। আলাপ এই রেস্তোঁরাতেই। শুরুতে ঊর্মি যাদের সঙ্গে আসত তারা এখন খুব কম আসে! হয়ত অন্য কোথাও দেখা করে। ঊর্মি কিন্তু নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝেই আসে, যেন একটা অভ্যাস। বাদলের সঙ্গে গল্প করে, চলে যায়। খাঁচায় পোষা পাখীর সঙ্গে মানুষ যেমন অর্থহীন এলোমেলো শব্দ করে, পাখীটাকে রাগায়, কথা বলাতে চায়, বাদল আর ঊর্মির গল্প করার ধারাটা যেন সেরকমই।

রবি তলিয়ে কিছু বোঝে না। সে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল আর বাদল ও ঊর্মির কথা শুনছিল। একসময় তিনজনের জন্য চা-ও আনালো। বাদল দেখল ঊর্মি যেন উসখুস করছে, অর্থাৎ রবির উপস্থিতিতে মেজাজটা মিইয়ে গেছে। বাদল রবিকে ধরল, 'কিরে বাড়ি গেলি না?' 'কি আছে বাড়ীতে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটব?' জবাবটা ছিল ঊর্মির দিকে তাকিয়ে সম্ভবত রোমাণ্টিক কণ্ঠস্বরে। 'রোজ তো ছুটিস, আজকের দিনটাতেই বুঝি ব্যাপারটা নতুন করে বুঝলি?' অপ্রসন্ন গলায় বাদল জিজ্ঞেস করল। রবি যেন তার দোষ বুঝতে পেরেছে এমন গলায় বলল, 'আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি, তোরা বরং গল্প কর।' এবার ঊর্মি কথা বলল, 'না-না, রবিবাবু, বসুন তিনজনেই গল্প করব। তা নাহলে তিনজনই উঠে যাব'। তারপর বাদলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নেশা করেছ নাকি? ওভাবে কথা বলছ যে?' কথাটা ধরে রবি বলল, 'করেনি তবে—' শেষ করতে না দিয়েই বাদল এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়, বিল চুকোবার জন্যে পকেটে হাত দেয়। বিস্মিত রবি আর ঊর্মিও উঠে দাঁড়াল বাদলের সঙ্গে সঙ্গে।

রেস্তোঁরার বাইরে এসে বাদল সিগারেট কিনল। ঊর্মি একটা মিষ্টি পান খেলো রবির পয়সায়, তারপর অন্যদিন আসবে বলে বাসে উঠল অনেকগুলো শরীর ঠেলেঠুলে।

'বাদল মাল খাবি ?'

'পয়সা আছে ? আমার কিছু নেই'।

রবির আসা মদ খাবে বলেই। গালাগালের যন্ত্রণাটা মিলিয়ে যাচ্ছে রবির। যদিও বাদলটা গোঁয়ার আর মদ খেলে তো কথাই নেই। তবু বাদল খুব নির্ভরশীল সঙ্গী।

'চল্ না, যা আছে তাতে হয়ে যাবে। তবে বাংলা খেতে হবে।' বাদল রবির পিঠে থাপ্পর বসিয়ে বলল, 'কেন শালা ? বাংলা কেন ? পয়সা বাঁচিয়ে বৌকে তেল দেবার ভেট কিনতে হবে ? তাই না শালা।' রবি লাফিয়ে সরে যায় একটু, 'যা আছে তোকে দেখাচ্ছি, এতে যদি বিলিতি হয়, আমি রাজী।' বলে পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে, বাদলের সামনে ধরে। বাদল ওদিকে তাকিয়ে বলল, 'ওতেই হবে, আমারও কিছু আছে।'

চৌরঙ্গীর ভিড় ঠেলে ওরা পাশের গলিতে ঢোকে।

ধোঁয়া আর কথাবার্তায় ফেটে পড়ছে ভেতরটা। জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। বাদল আর রবি মুখোমুখি। পাশের টেবিলে টক্‌টকে মেরুন রঙের পাঞ্জাবি পড়ে এক তরুণ মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দু হাত নেড়ে কবিতা আওড়াচ্ছে। তার দাড়িতে সিগারেটের সাদা ছাই লেগে। পাশের সঙ্গীটি বোধ হয় কবিতায় আপ্লুত, সে বলে উঠল, 'রাজা,তোর দাড়িতে বছরের প্রথম হিমপাত—বাঃ রাজা বাঃ।'

আজ প্রথম পেগে-ই বাদলের মাথাটা চন্ করে উঠল। আর একটা খেতেই রীতিমত নেশা। রবি এখনো স্বাভাবিক। বাদলের অবস্থাটা লক্ষ রাখছে। তৃতীয়বার অর্ডার দেবে কিনা ভাবছে রবি, 'আর একটা বল্।' বাদলের ভঙ্গীতে আদেশ। 'আর খাবি ?' একটু ইতস্তত করল রবি। বাদলই চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডাকল, পকেট থেকে টাকা বার করে বলল, 'দুটো, আর জল, ঠাণ্ডা।' তারপর রবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ অফুরন্ত খাব, টাকা নেই

ভেবেছিস ? তোর ভরসাতে মাল খাই নাকি ?' রবি বাদলের কথা শুনে হেসে উঠল, 'খা না, যতখুশি খা, আমি তো আছি !'

তৃতীয় পেগের অর্ধেকটা শেষ করতেই বাদলের চোখে বিশ্ব সংসার দুলতে শুরু করল, রবির উদ্দেশ্যে বলল, 'তোর ঊর্মিকে চাই ? ঘর আছে ? বল তুলে দিচ্ছি। তুই শালা হারামীর বাচ্চা, মেয়ে দেখলে হুঁস থাকে না, না ? যেই ঊর্মিকে আমার সঙ্গে দেখলি অমনি সেঁটে গেলি ?'

রবি খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল, তারপর বলল, 'ঊর্মি তোকে খুব ভালবাসে, নারে ?' গা গুলিয়ে উঠছে, 'ভালবাসা ?' কথাটা শেষ করবার আগেই রবির ধুতি-পাঞ্জাবীতে বমি করে দিল বাদল। আশে পাশে সবাই হঠাৎ ঘেন্নাতে চমকে উঠল যেন।

পাহাড়

কোয়ার্টারের সঙ্গে এত বড় বাগান সুমিতাকে অবাক করে। বিয়ের আগে ভাবতে পারে নি বাগান-আলা বাড়িতে সে থাকতে পাবে। এমন একটা বাড়ি আর স্বামী—স্বপ্নেরও অতীত।

বাগানটার পরে, অনেকটা পরেই, ধোঁয়াটে পাহাড়। সেদিকে তাকালে মনটা হু-হু করে। এ-ও রহস্য। ঠিক বোঝানো যাবে না। ওদিকে তাই তাকাতে ইচ্ছে করে না। তবু চোখ চলে যায়, যেমন, যতই অলকেশকে ভাববে না ভাবুক হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়বেই।

বিয়ের আগেকার অলকেশ—যে ভয় দেখিয়েছিল, সুমিতার সব সুখ সে ভেঙে দিতে পারে। কথাগুলো যে কত অর্থহীন! সাপ্তাহিক রাশিফল যেমন। বিয়ের পর স্বামীর হাত থেকে রকম রকম উপহার পেয়ে, পুরোনো কথায় ফেরার রাস্তাটা ভুলে যেতে হয়। চুমোয় তৃপ্ত সুমিতার নিশ্চিত মনে হয়েছে অলকেশ এবং ওর স্বামী মানুষ এবং পুরুষ হলেও, অলকেশ বিলিতি ডিগ্রিতে মূর্খ আর ওর স্বামী? তুলনা করাটাও আরেক মূর্খামি। অলকেশের দিকে, মানে অত নিচে তাকাতে গেলে, ভার্টিগো হয়।

সুতরাং বিকেলে বাগানে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসে সুমিতাকে দামী প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে হয়। চা ঢেলে দিতে দিতে জিগ্যেস করতে হয় স্বামীকে ঃ

বিলেতে তুমি খুব প্রেম করেছিলে, তাই না?

মনে নেই।

মানে, বলতে চাও না, এই তো?

পেপার-ওয়েটের বাংলা কি জানো?

ওদেশের মেয়েরা খুব গায়ে পড়া হয়, না?

পেপারওয়েটকে জলগর্ভ বলা যায় কি?

খুব বয়স লুকিয়ে রাখতে পারে মেমসাহেবগুলো?

ইংরিজি নামের এই বাংলা অনুবাদগুলো জঘন্য।

বিছানায়ও নাকি হুটহাট চলে আসে!

পেপারওয়েটকে পেপারওয়েট বললে যে কি ক্ষতি কে জানে! চাপা দেওয়ার কাজ নিয়ে কথা। যে শব্দটা চলছে……

থেমে একটা সিগারেট ধরায়, ধরিয়ে, সুমিতার দিকে মন দেয়। সুমিতার চোখের বাদামী তারায় ইতস্তত বিরক্তি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবে আদর করবে কিনা। তারপর ফর্সা কপালে তর্জনী দিয়ে বৃত্ত আঁকতে আঁকতে বলে, তুমি খুব সুন্দর তাই সুখি হয়েছ। আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। তপ্ত সিগারেটের মত ভাল-বাসাটাও যেন আঙুলে।

দুপুরে খাবার টেবিলে সুমিতাকে একা একা খেতে হয়। ওদিকে অফিসে অবকাশ পায় না ওর স্বামী নিরিবিলি লান্চের। টেলিফোনের বিরাম থাকে না। জিভে হালকা স্বাদ, জবাব দিতে হয় তা নিয়েই। ফাইলেও যে সই করতে হয় না, তা নয়। ইদানীং ডান হাতে কবজির গ্রন্থি মাঝে মাঝে কনকন করে। এয়ার-কণ্ডিশানের কুফল।

হঠাৎ কোনোদিন শূন্য টেবিলে ভালবাসার কথা মনে ওঠে। সুমিতার তখন ভাল লাগে ব্যাকুল হতে। ওর এখন সুখের পাহাড়। কোথাও কোনো ব্যাকুলতার ফাঁক রাখে নি স্বামী। তবু সে ব্যাকুল হতে চায় একা একা। অলকেশ এসে একবার ওর সুখের পাহাড় দেখলেই পারে। দেখুক না এ পাহাড় ভাঙতে পারে কি না! দেখুক না দেখি…খুব তো ভয় দেখিয়েছিল……

ভালবাসা

ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকেই শুরু। সিনেমায়, রেস্তোঁরায়, কখনো কখনো ট্যাক্সিতে আন্তরিক নিবিড় হয়েছে—নিজেকে অবারিত করেছে।

একদিন ছেলেটা খুনের দায়ে ধরা পড়ল।

খবর শুনে মুচকি হাসল মেয়েটি।

জেল থেকে চিঠি লেখে ছেলেটা, 'বলতে পার কেমন করে তোমার কাছে যাবো? দিন আমার পাথরের মত ভারি। অসহ্য। অসহ্য। মিতা, কখন আমাদের দেখা হবে?'

মেয়েটি চিঠি পেয়ে অনেকক্ষণ নির্জন হয়ে রইল। তারপর হেসে উঠল।

একদিন ভোর চারটেতে ছেলেটার ফাঁসী হয়ে গেল। সন্ধ্যে-সাতটায় তাকে চিতায় তোলা হল। আর সেদিন রাত আটটায় অনেকেই দেখেছিল মেয়েটি চিনির পট উলটে, টেবিলের কাঁচ খিমচে, মাথা গুঁজে হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

দিয়ানে হেব্‌রে

শুরুর কথা

বছর দশেক আগে আমি আজমির বেড়াতে যাই। সম্ভবত মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারী। সেখানে এক বাঙালী তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়। বলেছিল ওর বাড়ি সোনারপুর। পেটের ধান্দায় নাকি এ-দেশে। আলাপ থেকে দোস্তি। দু দিনের ম্যথায় আমাকে গুরু বলতে শুরু করে। নাম জগন্নাথ। চাকরি স্হানীয় একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে। আমি উঠেছিলাম সরকারী ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। এখানে রয়েছি জেনে আমার অর্থকড়ির যে কী সর্বনাশ হচ্ছে, তা চোখ বড় বড় করে এমন বলল, আমার শরীর তো হিম! প্রায় জবরদস্তি আমাকে এনে তুলল নিরিমিষ আস্তানায়। থাকা এবং খাওয়া সেখানে লভ্য—খুব একটা খারাপও না। বরাদ্দে পাওয়া গেল একটি ঘর, তাতে রয়েছে একজনের মত একটি চৌকি, হাস্যকর ছোট একটি টেবিল, গোটা দুই লোহার চেয়ার এবং অবিশ্বাস্য সিলিং-ছোঁয়া একটি কোন-কালের কাঠের আলমারি। ঘরটা একটু অন্ধকার মত। এদিককার সব ঘরই প্রায় এরকম। তবে থাকা খাওয়ার খরচখরচা যে সত্যিই কম ছিল সে-কথা কবুল করতেই হয়। ঘরে একটু গুছিয়ে বসার পর বুঝতে পারলাম না আলমারিটি কোন কাজে লাগবে। বস্তুটির কিছুমাত্র যত্ন নেই—খোলাই পড়ে থাকে। হাওয়ায় পাল্লা দুটো ভুতুড়ে দোল খায়। কোনো আলমারি যে এমন নিঃসঙ্গ হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। একদিন কৌতূহলী আলমারিটি ঘাঁটাঘাটি করতে করতে, তাকে, অন্ধকার কোণায়—প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা এক বাণ্ডিল কাগজ পেলাম হাতে। গোল করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। খুললাম। খুলে আমি অসম্ভব অবাক। বাণ্ডিলের কাগজে বাংলা লেখা! তখনো বুঝতে পারি নি, আসলে ওগুলো চিঠি। বাংলা লেখা দেখে অধৈর্য খুলে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। ঠিকানার কোনো হদিশ নেই চিঠি-

গুলোতে। ব্যবহৃত খামও নেই—একটিমাত্র ইনল্যান্ড রয়েছে। তাতেও ঠিকানাটি এমনভাবে কাটা—কোনো কিছু উদ্ধার করা শিবেরও অসাধ্য। প্রত্যেক চিঠির মাথায় শুধুমাত্র জয়সলমির শব্দটি লেখা। তারিখ বা বাড়ির কোনো ঠিকানা নেই সেখানেও। জয়সলমির রাজস্থানের মরুভূমি-শহর। চিঠিগুলো জনৈকার লেখা কোনো একজন পুরুষকে—যিনি জনৈকার চেয়ে বয়সে ছোট। জনৈকা সম্ভবত তরুণী—নাম মালা। দিনে জগন্নাথের সঙ্গে আজমির শহর এবং আশেপাশে ঘুরে বেড়াই আর রাত্রে খাওয়ার পাট চুকিয়ে একান্তে চিঠিগুলো নিয়ে বসি। শুরু হল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। যত পড়ি চোখের সামনে ভেসে ওঠে গল্পের একটি এলোমেলো ছক। প্রেমের কিন্তু বেদনার। সুসংবদ্ধ কোনো কাহিনী পাওয়া অসম্ভব, তবু যদি তারিখ থাকত তাহলে অন্তত একটি ক্রম খুঁজে পাওয়া যেত। আশা কিন্তু ছাড়লাম না। আন্দাজমত পর পর সাজাতে শুরু করলাম—পড়তে পড়তে। কাজটাতে মজে গেলাম, যেন ঘোর লাগল। চিঠিগুলোকে দু ভাগে ভাগ করলাম—(১) যেখানে গল্পের সংকেত রয়েছে আর—(২) যেখানে তা নেই। দ্বিতীয় ভাগ সরাসরি বাতিল করলাম। পড়লাম প্রথম বাছাই নিয়ে। গোটা চিঠি নয়, চিঠি থেকে টুকরো টুকরো অংশ পর পর নম্বর দিয়ে টুকতে থাকলাম সাদা খাতায়। সেদিন আজমিরে বসে যা টুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসছিলাম আজ তা ছাপতে দেবার মুহূর্তে মনে হচ্ছে—সম্ভবত ব্যাপারটা ভালই হল। চিঠির কোনো অংশ যদি নায়ক নায়িকা কারো চোখে পড়ে তাহলে কি সেই অসামান্য ফেলে আসা দিনগুলো ভেবে একবারের জন্যেও অমনস্ক বা ব্যথাতুর হবেন না ?

এই চিঠিগুলোর ভাষা, বাক্যগঠন, রচনাশৈলী সবকিছুর কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব লেখিকার। আমি কোথাও কলম ছোঁয়াই নি। প্রথম চিঠির মাথায় জয়সলমির রেখে অন্যগুলো থেকে বাদ দিয়েছি। প্রথম চিঠিতে রেখে পাঠককে জয়সলমিরে আটকে রাখলাম। চিঠির ইতি-তেও লেখিকার নাম বাদ দিয়েছি কারণ আগেই সে-নাম উল্লেখ করেছি। আন্না আখমাতোভার কবিতা-পংক্তি ক'টি অবশ্য আমার সংযোজন। শুধু এটুকুই।

Today they brought no letter for me :
he forgot to write or may be
went away ;
He was with me such a short time ago,
So in love, tender, mine,
but that was in white winter.
now it's spring, and spring's
melancholy is poison
he was with me such a short time ago.

Anna Akhmatova.

জয়সলমির

১. মাঝে মাঝে আমি যেই বানানগুলো ভুল লিখি সেইগুলো বলে দিও। কাউকে আমি চিঠি দেখাই না। আমি ভাবি চিঠির মাহাত্ম্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাই আমার spelling mistakeও শোধরাবার chance থাকে না।

২. এবার এখানে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তিরিশ বছরেও নাকি এরকম শীত পড়েনি। একে তো শীত সহ্য হয় না তারপর এত শীত—আমার যে কি অবস্থা আমিই জানি।

৩. চিঠি লিখছি ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে। তুমি আরও দু-একটা ছবি এঁকেছ শুনে খুব ভাল লাগছে। তোমার ছবির যেদিন প্রথম এগজিবিশন হবে, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে পাঁচ পয়সার বাতাসা চড়িয়ে পুজো দিয়ে আসব। যা কুঁড়ের বাদশা তুমি, কতদিনে যে ঠাকুরের কপালে পাঁচ পয়সার বাতাসা জুটবে কে জানে।

৪. সখ আছে মেয়ে নিয়ে পালাবার।

৫. তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। কি যে ভাল লাগছে

তোমাকে কি বলব। ভাল লাগার যদি একটা মাপকাঠি হত মানে Scale, তাহলে আমার ভাল লাগাটা highest ponit-এ দেখাতে পারতাম। তোমার চিঠি পড়ে পড়ে এমন অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে যে অন্যের চিঠি পড়তে কিছুতেই interest লাগে না। তুমি লিখেছ, 'তোমার এখন লেখাপড়া করার সময়। জয়সলমিরে আমার সবার প্রয়োজন তোমার মনে হবে না।' এই ধরনের লেখা পড়লে মনে হয় যে তোমাকে······যাকগে বলব না।

৬. তোমার ভাবনা একেবারে ভুল। বাতাস ঘরে এলে আমি কেন ভাবতে যাব সে এল নাকি? আমি তো জানি সে সব busy মানুষ, train ধরবার সময় কোথায়। তোমাকে photoতে চিনতে পারব কি না জিগ্যেস করেছ। চিনব কি করে? তোমাকে কোনোদিন দেখেছি চোখে! কেবল কল্পনা ক'রে তো আর চেনা যায় না। ···বয়সের দিক দিয়ে হয়ত innocent আছ কিন্তু মনের দিক দিয়ে অনেক mature, যা খুশী নির্ভয়ে লিখতে পার, আমার modern ছবি ভাল লাগে না একথা আমি একবারও বলিনি। তোমার 'New year' ছবিতে প্রকৃতির রূপ আমি মাঝেমাঝেই দেখে থাকি। আমার খুব ভাল লাগে, হয়ত ভাল লাগাটা ভাল করে express করতে পারি না। ঠিক আছে এবার থেকে কোনো comment করব না—তাহলে আর ভুল অর্থ লাগিয়ে নিতে পারবে না। একটা মজার কথা বলি। ভরদুপুর! তোমার অগোছালো, একলা-থাকার ঘরে কড়া নাড়লাম, তুমি শুয়েছিলে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছবি এঁকে একটু শুয়েছ। নিজের মনে গজরাতে গজরাতে উঠলে, 'এরা কেন যে দুপুরবেলা আসে কে জানে?' তারপর দরজা খুলেই অবাক—ঘুম হল না। তোমার এদিকে আসবার কি হল? খুব বোকা বানাতে পার। আর তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করব না।

৭. আমার অনেক কথার চিঠিটা তুমি পাওনি। সেটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার অভিমান করা চিঠি আমি ঠিক পেয়েছি। পেয়ে ভাবছিলাম এটাও হারাল না কেন। তাহলে শোধবোধ। চুকে যেত। দ্বিতীয় চিঠিখানা অনেক রাত্রে পড়ালেখার মাঝে হাতে পেলাম। পেয়ে জানতে ইচ্ছে হল, 'এ নিশীথকালে কে আসি

দাঁড়ালে ?' তোমার এ চিঠিখানা সত্যি খুব সুন্দর লেগেছে। চিঠিখানা এখন আমার সামনে খোলা।

৮. আমি তোমাকে সেই প্রশ্নটার উত্তরে লিখেছিলাম, ধর্ম যখন কিছু করতে পারে না, তখন মানুষের জীবনযাত্রায় এসে দাঁড়ায় কেন ?

৯. আজ একেবারে free তাই সবচেয়ে আগে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। পরীক্ষা ভাল হয়নি। পরীক্ষা দিয়েছি তোমার দেওয়া পেন দিয়ে, দেখি কি হয়।

১০. পাতা ঝরা দেখতে আমার কিন্তু একেবারে ভাল লাগে না। যারা বুড়ো তারা প্রকৃতির সবকিছুতেই নতুনত্ব দেখতে পায়। এই যেমন পাতাঝরা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত। এদের সাথে নানা জিনিসের তুলনা শুরু করে। সূর্য উঠছে তাতে কি হয়েছে ও তো রোজই ওঠে, এতে নতুনত্ব কি ? পাতা ঝরছে, ও তো ঝরবেই বসন্ত যে এসে গিয়েছে। এই season এ ঝরা উচিত। তবে প্রকৃতির বর্ণনা পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আমাকে ভারী রাগী মেয়ে লিখে আবার কেটে দিয়েছ। কিন্তু আমি পড়ে ফেলেছি। ভালভাবে কাটো না কেন ?

১১. কখনো কখনো ইচ্ছে করে রোজ একটা করে চিঠি লিখি। কেন না আমি লক্ষ্য করেছি বেশ কিছুক্ষণ পড়ালেখা করার পরে যদি একটা চিঠি লেখা যায় তাহলে mind এর tension অনেক কমে যায়।

১২. আঁহে ন ভরি শিকওয়ে ন কিয়ে
কুছ ভি ন জুবাঁ সে কাম লিয়া
ইস পর ভি মুহব্বত ছুপ ন সাকি
জব তেরা কিসি নে নাম লিয়া।

একটা শায়েরী দিয়ে আজকের চিঠি শুরু করলাম। জানো আজকাল শায়েরী পড়ছি। তোমার বয়স কত তা আমি জানি না, না কোনোকালে জানবার ইচ্ছে থাকবে। বয়স তোমার যতই কম হোক তাতে কি ? কম বয়সের সঙ্গে কি চিঠি লেখা যায় না ? আমি হয়ত তোমার চাইতে বড়জোর দু এক বছরের বড়—সে যাই হোক

তোমাকে আমি এখন যেভাবে চিঠি লিখছি ঠিক সেভাবেই লিখব। Style আমার পালটাবে না—তবে ভাবি তোমার বয়স আমার চাইতে কম হল কেন? পুরুষের বয়স সবসময় মেয়েদের চাইতে বেশী হতে হবে?

এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে।

১৩. আজকাল কি আঁকছ? কতদিন তুমি ছবি পাঠাওনি। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। You can fulfil my desire. কি এমন ছবি আঁকছ কোনোদিকে তোমার চোখ দেবার ফুরসৎ নেই।

১৪. তুমি চিঠিতে মরবার-টরবার কথা কেন লেখ? লোককে কষ্ট দিতে খুব ভাল লাগে, না? আমি দুটো লাইন তোমাকে present করলাম—

তুঝে আউর ক্যা দুঁ ম্যায়, দিল কে সিবা
তুঝকো হামারি উমর লাগ যায়।

এখানে এখন মরুভূমির গরম। ভাবতে পারবেনা এ গরম কি চিজ।

১৫. তোমার সঙ্গে আজ কিন্তু খুব ঝগড়া করব। কেন লিখেছ, 'তোমার চিঠি দিতে ইচ্ছে করে না তা সোজাসুজি বলে দিলেই পার।' এই Sentence টা কেন লিখেছ? 'বাহানা' শব্দটা কেন use করেছ?

১৬. Please আমার একটা কথা রাখো। কোনো রকম Presentation পাঠিও না। কোনোদিন নিজের থেকেই একটা জিনিষ চেয়ে নেব, তবে সেটা কি এখন নয় নাই বললাম।

১৭. তোমার হাতের লেখা অন্যকারোর চোখে সুবর্ণ না হতে পারে কিন্তু আমার চোখে সুবর্ণই।

১৮. বেশ কিছুদিন আগে তোমার চার লাইনের লেখা ৺বিজয়ার চিঠিখানা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই চার লাইন চিঠির কি উত্তর হতে পারে সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় পরে বড় করে আর একটা চিঠি দিবে। সেই চিঠি আর কই এল! অপেক্ষাই শুধু করলাম।

১৯. 'যেতে নাহি দিব' বলে তোমাকে আটকে রাখতে পারলাম না। বরং 'যেতে দিতে হবে', বলে সেদিন অশ্রুভরা চোখে বিদায় জানাতে হল।

আমাদের সে কটা দিন বেশ আনন্দে কাটল। যাক এবার থেকে হয়ত জয়সলমির-এর কথা ভুলতে থাকবে। এখানের নির্মম পরিবেশে তুমি স্বাস্থ্যলাভ করেছ শুনে আশ্চর্য হই।

একটা কথা, এখন কাজে ভালভাবে মন বসেছে তো?

২০. আমার বেশ ছুটিটা কাটছে। সারা সকাল বাড়ীর আলতু-ফালতু কাজ, দুপুরে গল্পের বই। সারা বিকেল সামনে-পেছনে মরুভূমির বালিতে জল দেবার জন্য একটা পাইপ নিয়ে বসে থাকি। এই বাহানায় পিয়নটার অপেক্ষা করি। কেননা ও বিকেলে আসে। মরুভূমির দেশে দুপুরে কাজ হয় না। যদি দেখি সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে করে পাইপের জল দিয়ে ওকে আর ওর সব চিঠিপত্র ভিজিয়ে দিই—চিঠি না আনবার শাস্তি।

২১. আজকের দিনটা নানারকম ঝামেলায় কেটেছে। যে কোনো কাজ করতে গেছি বাধা পড়েছে। তাহলে বুঝতে পারছ মনটা কেমন ক্ষিপ্ত। রাত্রে শোবার আগে তোমার কথা মনে পড়ল যার ফলে mindটাকে rest দেবার জন্যে এই চিঠি লেখা। একে বলে '**A** kind of mental mechanism.'

২২. বন্ধুদের কাছে তোমার খুব গল্প করেছি। সবাই খুব হেসেছে। তোমার নিশ্চয়ই বিষম লেগেছিল, হয়ত খেয়াল করনি। তবে তুমি যে আমার ছোট এ কথাটা বলিনি।

২৩. ভ্যানগগের ছবির Print গুলুর মধ্যে কিছু কিছু আমার আগেই দেখা ছিল। আমি এবার বুঝলাম তুমি কেন লেখ এই জীবন dull—সেখান থেকে পালাতে চাও। নির্জন পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিতে ইচ্ছে করে—কি বল?

২৪. তোমাকে চিঠি লিখতে বসে আমার আজকের রোববারের দুপুরটাই লেগে গেল। বিশ্রাম করতে দিলে না। মাঝে মাঝে ভীষণ জ্বালাতন কর। রেডিও-টাও মন দিয়ে শুনতে পারছি না। মাঝে মাঝে কানে আসছে, 'তেরে হি স্বপ্নে লে কর সোয়া / তেরেহি

য়্যাদো মে জাগা / তেরে হি খেয়ালোঁ মে উলঝা রহা মেয় / জৈসে কি মালা মে ধাগা।'

২৫. অনেকদিন বিশ্রাম হল। এবার আবার অন্য কিছু করার ইচ্ছে করছে।

২৬. তুমি কি মনে কর যে একদিন আমাদের চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে যাবে?

২৭. কিছু ঘুম কিছু স্বপ্ন দুটোই পাঠাতে বলেছ। কিন্তু দুটোতো আর পাঠানো চলে না। ঘুম পাঠালে স্বপ্ন পাঠাই কি ক'রে? গভীর ঘুমে মানুষ স্বপ্ন দেখে না, মানে যে সব স্বপ্ন সে দেখে তা মনে থাকে না। (স্বপ্ন না দেখলে সে পরের দিন কাজই করতে পারবে না।) আমার ঘুম খুব গভীর।

২৮. Money bag এর কথাটা বেশ মজার। তাহলে বল সেদিন দু প্যাকেট সিগারেট দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম! তা না হলে খুব অসুবিধা হত। এত কম বয়সে তুমি এত চাপা কেন? আবার লিখেছ, 'ভয় হয়েছিল যদি money-bagটার ভেতরে দেখে নিয়ে থাক।' এখন ভাবছি দেখে নিলেই বোধহয় বেশী ভাল হত।

২৯. 'Far from the madding crowd' এ যে নায়ক নায়িকাকে শেষে বিয়ে করল আমার কিন্তু তার চরিত্র বেশী ভাল লেগেছে, অবশ্য এটা আমার মত।

৩০. আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি দিন দিন খুব বেশী sensitive হয়ে পড়ছ। ছবির কথাটা এমনিই বলেছিলাম। তুমি যে তাতে এমন রেগে যাবে বা তোমার খারাপ লাগবে আমি একদম বুঝতে পারিনি। তাহলে আমি কোনোদিনও বলতাম না। তুমি ফ্রেডেয় পড়েছ? তোমার ছবি 'পাহাড়তলি' ভাল লাগল। একটু বৃষ্টির আমেজ দিলে আরো wonderful হত।

৩১. ছুটি যখন পাচ্ছ এখানে আসতে পার না? বেশ তো, বাড়ীতে না ওঠো হোটেলেই ওঠো না। তারপর না হয় টেনে-হিঁচড়ে বাড়ীতে নিয়ে আসা যাবে। তুমি তো আমাকে ভীতু বলেছিলে— হোটেলে গিয়ে সাহসটা দেখাতে হবে না?

৩২. তুমি আসবে না এমন Frankly বলে দিলে যে বেশ রেগে গিয়েছিলাম কিন্তু।

৩৩. কেমন বৃষ্টির দিনে তোমার ওখানে দেখা হল?

৩৪. কিছুতেই আর শেষ করতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে Inland টা আরো দু পাতার হলে বোধ হয় বেশী ভাল হত।

চিঠি একটু তাড়াতাড়ি দিও please.

৩৫. এখন বল তোমার শরীর কেমন আছে? ছবি আঁকা বোধ হয় খুব জোরেশোরে চলছে, না? তা বেশ বোঝা যাচ্ছে চিঠিপত্র দেবার ধরন-ধারণ দেখে। Taunting আমিও করতে জানি।

৩৬. আমার এখন কাজ হয়েছে মরুভূমির ধুলো সারাদিন কেমন করে ওড়ে তাই দেখা আর রাত্রে কিছু মুখে দিয়ে টানটান শুয়ে পড়া। কখনো কখনো ভাবি এই কি জীবন? আরো অনেক কিছুই ভাবি যা সবসময় সবাইকে বলা যায় না। আমার ভাবনা-চিন্তা অন্যের কাছে অর্থহীন মনে হবে। আমি সেই ব্যাপারে নিজেকে খুব control করি। মাঝেমাঝে একমাত্র তোমাকে লিখি। তুমি 'সরসরি নিগাহ্ দৌড়ানা' সেরকম করে পড়ে ফেল। মাঝে মাঝে অবশ্য তোমার মধ্যে tension এর সৃষ্টি হয়, এই tension ছবিতে নানা রঙে ডুবিয়ে দিতে না পেরে অস্বস্তিতে কষ্ট পাও। তাহলে বুঝে দেখ তোমাকেও বলা চলে না। প্রিয়জনের জ্বর হয়েছে শুনলে ভাল লাগে কি?

৩৭. আজ তোমাকে চিঠি লিখতে খুব ভাল লাগছে। ভেতর থেকে কেমন যেন মনে হচ্ছে। কেন এরকম feeling হচ্ছে? এর অর্থ কি? হবে কিছু, analysis করবার দরকার কি? Pasternak এর কবিতা পড়েছ? যদি পাও পড়ে নিও। ছবি আঁকার সঙ্গে কবিতা পড়া ভাল। তোমাকে পাঠাব। এখন না জানুয়ারীর পর। Pasternak এর একটা কবিতা আছে। wet paint—পড়ে দেখো ভাল লাগবে।

৩৮. আসো না আবার জয়সলমিরে। কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যাও। সারা দুপুর বসে আমরা রোজ আড্ডা দেব। ছেলেবেলাকার School-College life এর নানান কথা আবার করে একজন অন্য-

জনের কাছ থেকে শুনব। আর হাসব। খুব বেশী করে প্রাণখোলা হাসি হাসব। রাজী তো? বড় দূরে থাকো। ডাকাও সম্ভব নয়। গাড়ীভাড়া যে প্রচুর।

৩৯. গত কয়েক বছরেতে অন্তত একবার করে দেখা হত, এবার অনেকদিন হয়ে গিয়েছে তোমার সাথে দেখা হয়নি। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। you can fulfil my desire.

আমার চেহারার যে স্কেচটা পাঠিয়েছ সেটা কেমন হয়েছে, লিখলাম না। তুমি আবার বলবে 'credit goes to you.'

৪০ তুমি জানতে চেয়েছো অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে আমার হিংসে হয় কিনা। মোটেই না। আমি ভীষণ অহংকারী মেয়ে।

৪১. রামায়ণের গল্প নিয়ে ছবি আঁকার কি হল? আমাকে চিঠিপত্র না দিয়ে সে সময়টা এই কাজে দাও না। এক নাগাড়ে একটা কাজে লেগে থাকতে তোমার হয়ত ইচ্ছে করবে না। কিন্তু কাজটা কিছুদূর এগিয়ে গেলে আঁকাটা একরকম অভ্যেস হয়ে দাঁড়াবে। আমি ধারে-কাছে থাকলে অনেক help করতাম। আর কিছু না হোক রাত জেগে অনেকক্ষণ আঁকলে কিছুক্ষণ পরে পরে চা বানিয়ে দিতাম। অনেকটা সময় তো নষ্ট করলে এবার না হয় আমার কথায় একটা ভাল কাজ কর।

Christmas-এর ছুটিতে এসে মরুভূমির শীত দেখে যাও না কেন?

৪২. তোমার চিঠি পেলাম, I feel in the air a faint smell of your sweet presence. রাগারাগি না করলে দেখছি বড় চিঠি পাওয়া যায় না।

৪৩. তুমি কেমন ছেলে বুঝতে পারি না। আমি না লিখলে তুমি নিজের ইচ্ছেতে এখানে আসতে পার না? অবশ্য লিখেও তো কোনো ফল দেখি না।

৪৪. আমি যখন mentally disturbed থাকি তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ে। তাই কখনো কখনো তোমাকে চিঠি লিখে আসবার অনুরোধ করি।

৪৫. আমি রামায়ণের ছবি আঁকতে বলাতে কত কথা শোনালে।

অথচ একটুও ভেবে দেখলে না যে এরকম করে কেউই বলবে না। তুমি পারবে বলেই তোমাকে বলেছি। মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমার কথা seriously শুনতে হবে এমন কিছু dictionary-তে লেখা নেই।

তোমার আঁকা ছবি দেখতে দেখতে ভাবি মরুভূমির মধ্যে কোথাও একটা Oasis রয়েছে। সেটাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

৪৬. হাসিটা সেইরকমই আছে, না হাসতেও ইদানীং ভুলে গিয়েছ ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। জানার থেকেও চোখ দুটো দিয়ে অনেকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে।

৪৭. তোমার চিঠিতে একটা লাইন পড়ে দারুণ হাসি পেয়েছিল। 'Have you lost interest in me ?' কতদিন interest রাখতে হবে বলতে পারো ? ততদিন না হয় একটা bond সই করে দিই। তারপর কিন্তু মেয়াদ বাড়াতে পারব না বলে দিলাম।

কি তাড়াতাড়ি যে একটা বছর কেটে গেল টেরই পেলাম না। একটা ভাল ছবি এঁকে নতুন বছরে present কোরো।

৪৮. বড় বেশী ফাঁকা লাগছে। বাড়ীতে কিছুতেই ভাল লাগছে না। সময় যেন কাটতেই চাইছে না। তুমি নিশ্চয়ই খুব কাজের মধ্যে আছ ? কাজ করা অনেক ভাল। তাতে একটা আনন্দ আছে। চুপচাপ বসে থাকা অসহ্য।

৪৯. তুমি বেশ ঘুরে বেড়াও। খুব মজা। আমার কোনো chance নেই। এই সেদিন নেপাল ঘুরে এলে। তারপর উড়িষ্যা। এবার খাজুরাহো যাবার তালে আছো ! খাজুরাহোতে আমি তোমার প্রথম অতিথি হব। প্রথম অতিথির 'খাতিরদারী' বেশী হবে না ? তবে তোমার বেশী দিন ভাল লাগবে না কোথাও। তোমাকে তো আমি চিনি (তুমি না চিনলেও)। তোমার কাছে সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি একঘেঁয়ে হয়ে যায়।

৫০. তোমার বন্ধু অমিতবাবু হঠাৎ আসাতে মনে হয়েছিল তুমি নিজেই এসেছ। খুব ভাল লেগেছিল। তোমার সুখ্যাতিও করল, নিন্দেও করল। জানবার খুব curiosity হচ্ছে, না ? কেন বলব ?

৫১. একটা চাকরি দিতে পার যাতে গরমে ছুটি পাওয়া যায়

আর পাহাড়ে ঘোরা যায়। একটা chance পেয়েছিলাম পহেলগাঁও যাবার কিন্তু গেলাম না। পহেলগাঁও কি আর একা যেতে ভাল লাগে বলো তো? তোমার মত একটা 'ছোটভাই' থাকলে খুব ভাল লাগে ওসব জায়গায় বেড়াতে, তাই না?

৫২. আমার চিঠিগুলো আবার থেকে কেন পড়ছ? কেনই বা জমিয়ে রেখেছ? আগুনে পুড়িয়ে দাও। নিজে না পারলে আমাকে পাঠিয়ে দিও আমি জ্বালিয়ে দেব। (এই চিঠিটা পেন্সিলে লেখা)।

৫৩. আজ কতদিন বাদে বাংলা লিখতে বসেছি। তোমাকে বহুদিন চিঠি লিখিনি। আর লিখবই বা কি? আর কিছুদিন যাক্, তারপর লিখবার একটা topic পাব। কি সেটা জানো? মাথার কটা চুল সাদা হল, চোখের জ্যোতি কতটা কমল। আমার চিঠি না পেলে দেখছি তুমিও আর লিখতে চাওনা। কেন? আগেতো চিঠি না পেলে লিখেই যেতে। Last চিঠিটা অবশ্য post-card এ দু'লাইনে লেখা ছিল।

৫৪. You are very responsible boy but sometime your anger is impetuous. তোমার কাছাকাছি একটা বাড়ী নিলে কেমন হয়? তাহলে এই চিঠি লেখার ঝামেলা বাঁচে। চিঠি যত বড়ই লিখি না কেন বা পাই না কেন কিছুতেই যেন মন ভরে না। মনে হয় কিছুই বলা হল না। তোমাকে দু'লাইন হিন্দি কবিতা শোনাই ঃ

তুঝ্ মে
মুঝ্ মে
এক দেহরী ভর্ কা অন্তর্
আউর উসে ভী লাঁঘ ন পাই
সংকল্পো কী সাধ হামারী।
ইসকা অর্থ য়হী শায়দ?
য়্যা তো ম্যায় আপনে মে প্রশ্ন বন্ চুকী
য়্যা তুম
উত্তর বন কর ঠহর্ গয়ে হো।

৫৫. এবার তোমার চিঠির কাগজটা ভারি সুন্দর ছিল। সত্যি

সুন্দর। তোমার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তো কথাই বললে না। উলটে শুনিয়ে দিলে—

কহ দো ইন হসরত সে
কঁহি আউর যা বসে
কি ইতনি জগাহ: নহি মেরে
দিলে দিদার পে।

৫৬ বাঃ আমার কপালে টিপের বর্ণনাটা তো দারুণ করেছ।

৫৭. আমাকে রাজা বা রাণী সাজাতে তোমার দেখছি খুব সাধ। তা না হলে স্বপ্নে আমাকে দেখলে রাজার বেশে আর দিনে কল্পনা করলে রাণীর বেশে। আমিও সত্যি সত্যি ওই দুই বেশে নিজেকে কল্পনা করে নিলাম। কেননা তুমিই বলেছ—'আচ্ছা ভাব'…

৫৮. এবার philosophy নিয়ে পড়েছ। Philosophy টা আমার বুঝতে একটু কঠিন লাগে। তোমার বোধহয় ভাল লাগে। তাতে কি ছবি আঁকতে সুবিধে হয়? ফ্রয়েডের 'Interpretation of Dream' পড়বে। তোমার ইচ্ছে না করলেও আমার জন্যে পড়তে হবে। বইটা এখানে পাওয়া যায় না।

৫৯ তোমার ওখানে চাকরী পাইয়ে দেবার খুব লোভ দেখাচ্ছ! সত্যি সত্যি চলে যাব কিন্তু।

৬০. চিঠির সঙ্গে যে স্কেচটি পাঠিয়েছ, বেশ ভালো এঁকেছো। আগে জয়সলমির থেকে ফিরে কত ছবি আঁকতে—এবার মনে হচ্ছে এখান থেকে অন্য মন নিয়ে ফিরেছ। কেন এরকম হল? ঠিক আছে, আর কোনো দিন জয়সলমির আসতে হবে না। তুমি বরং ভালো মানুষের মতো তোমার জায়গাতেই বসে থাকো।

৬১ কিছুদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্নটা তোমাকে নিয়েই ছিল। এখন লিখবার সময় একদম মনে করতে পারছি না। স্মৃতিশক্তি একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছে। অথচ আমি এটুকু জানি স্বপ্নটা জানতে পারলে তোমার কান নির্ঘাত লাল হয়ে যেত।

৬২. তোমার দেওয়া কালো আংটিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। মনটা তাই ভীষণ খারাপ। তুমি হয়ত ভাল মনে দাওনি।

৬৩. …পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরবার সেই কথা ভীষণ মনে

পড়ে। ইচ্ছে করছিল তোমাকে জিজ্ঞেস করতে, তুমি কিছু চাইবে ?

৬৪ If you don't mind তাহলে মনে করতে পারি পুজোর ঠিক চার পাঁচ দিন আগে তোমায় কোনো একটা হোটেলে গিয়ে ধরেছি। এ খবরটা দুনিয়ার কেউই রাখল না। তারপর সব কাজের পেছনে Id হয়ে উঠল ভীষণ active—আমরা যা অনেক বছর ধরে চাইছিলাম।

৬৫. তুমি লিখেছ বিষণ্ণ আলোয় পাশাপাশি বসে গল্প করার মত সুখ আর নেই। একমত। তবে সবাইর সাথে ওরকম environment-এ গল্প করতে ভাল লাগে না। উল্টে আমার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়।

তুমি হয়ত বলবে, 'তুমি কি নিজেকে অসাধারণ কিছু মনে কর ?' আমি বলছি, 'করি, তোমার সাথে intimacy থাকাতে ধারণাটা develop করেছে।'

৬৬. জয়সলমির বাজারের ধুলোময় বিকেলের কথা তোমার মনে আছে ? 'ওহ্ শাম ভি কুছ আজিব থি। এহ্ শাম ভি কুছ আজিব হ্যায় (চিঠির লেখার সময়)। ওহ্ তব ভি পাস পাস থে। ওহ্ আজ ভি করিব হ্যায়।'

৬৭ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখনও কোথাও একটা ধ্রুবতারা (মরুভূমির আকাশে তারা খুব জ্বলজ্বল করে) টিমটিম করে জ্বলছে যে আমাকে এখনো বেঁচে থাকার উৎসাহ দিতে পারে।

মানসিক যন্ত্রণা পাওয়াটা তোমার একটা chronic রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বোধহয় সব Artist-এর হয়।

'রক্ত-করবী' বইটার খোঁজ করেছিলাম। মরুভূমির দেশ জয়সলমিরে রক্ত-করবী পেলাম না।

৬৮. জানতো রাজস্হান হল Tourist-এর দেশ। একটা Tourist Agency-তে চাকরী পেয়েছি। এখন সময় কাটাতে অসুবিধা হচ্ছে না। তবে Season শেষ হয়ে গেলে আবার বেকার। বাড়ী ফেরার পর বড় টায়ার্ড মনে হয়।

৬৯. আমি যেন একদম exhausted হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে গান গাইতে ইচ্ছে করে পাগলের মত, মীরা বাঈয়ের মত পথে বেরিয়ে

পড়তে ইচ্ছে লাগে। 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। বিষ যেন গলায় আটকে আছে—নিচে নামতে পারছে না। তাহলে একেবারেই ফুরিয়ে যেতাম। আমারও শান্তি তোমারও রেহাই।

অনেক রাত তো হল আর কতক্ষণ আমাকে জাগিয়ে রাখতে চাও। জানো না আরো রোগা হয়ে যাব? একটুও মাংস তো দিতে পার না, খালি মিষ্টি কথা। Siren বাজল, তার মানে এখন রাত একটা।

সবদিকের জানলা দরজা একেবারে বন্ধ করে বসে আছ।

৭০. রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটা জিনিষ mark করেছি। কবি 'মালা' এবং 'প্রদীপ' শব্দ দুটো খুব ব্যবহার করেছেন। তুমি ছবিতে সবচেয়ে বেশী কোন্ জিনিষ আঁকো বলতে পার? হাত।

৭১. তোমার রাত জেগে লেখা চিঠি আমি ঘুম থেকে উঠে পেলাম। হাসি পাচ্ছে? সত্যি বলছি। দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি দরজার ফাঁক দিয়ে তোমার চিঠি peon ফেলে গিয়েছে। আজকাল তোমার চিঠি অনিয়মিত ও ছোট। একটা কথা জেনো আমি ভেতরে বেশ জিন্দি। আমিও নিশ্চিন্তে 'মৌনিবাবা' হয়ে থাকতে পারি।

কথা ছিল এক তরীতে
কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে

৭২ ঠিক দোলের দিন সারা গায়ে রঙ্ লাগিয়ে তোমার একটা envelop আমার হাতে এল। ভাবছি আর কোনোদিন এরকম চিঠি কি আসবে? বারবার কি আসে?

৭৩. রাজনীতির কিছুই আমি জানি না। সব থেকে রাগ হয় কখন জানো? অনেক কষ্টে হয়ত minister-দের নাম মুখস্থ করলাম ওমনি Next election-এ সবাই হেরে ভূত। আবার নতুন করে মুখস্ত করা।

৭৪. আমি রেকর্ড-প্লেয়ার কিনব না। যদি পারি একটা tape-recorder কিনব। তোমার কথা টেপ করব যাতে অবসর মুহূর্তে তোমার গলা বসে বসে শুনতে পারি। আর টেপ্ করব তিনটে মাত্র রবীন্দ্রসংগীত।

(১) না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে

(২) কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না

(৩) ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু

৭৫. পরশু একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম তুমি একটা Rifle নিয়ে এসেছ আমাকে মারতে। অপরাধ? আমি কেন তোমাকে ভুলে গিয়েছি।

তোমার কাছে বড্ড frank হয়ে পড়ছি, না?

তুমি লিখেছ আমার এখন ঘরসংসার করতে ইচ্ছে হয়েছে—মোটেই না খোকা।

৭৬ তোমার আঁকা দুখানা স্কেচ পেয়ে বেশ বুঝতে পারছি তোমাকে আঁকার নেশায় পেয়েছে। কাছে থাকলে পুরস্কার স্বরূপ কি দিতাম বলো তো? ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়ে এক কাপ চা।

৭৭. আমার এখন কথাটা ভাবলে হাসি পায়। নিরীহ-গোবেচারা একটা 'দিদিকে' সামান্য দুটো কথা বলতে কিভাবে ঘেমে উঠেছিলে। সুরাইয়ার একটা গান মনে পড়ছে 'ছোটিসি বাত মোহব্বতকি ওহ্ ভি কহি নহি যাতি'……আমি চাই তুমি শুধু ছবি এঁকে যাও, চিরদিন, আর আমি সেই ছবিগুনু দেখে যাই।

আমি চাই আমার হৃদয়কে তুমি দেখবে একটা পাতাবাহার গাছের মত।

৭৮ কখনো কখনো ভাবি মরে যাই। মরার আগের মুহূর্তে বলব তোমাকে টেলিগ্রাম করতে। সবাই অবাক হয়ে যাবে এমন কথা শুনে। আমি তো মরেই যাচ্ছি আমার আর লজ্জা কি? মরবার আগে তোমাকে একবার দেখতে চাই।

৭৯ ভীষণ টফি খেতে ইচ্ছে করছে। টফি নিয়ে একদিন চলে এস না?

৮০. আমার বড় হিংসে হয় তোমার আঁকা মেয়েদের ছবি দেখলে। তোমার সারাদিনের সব থেকে ভাল মুহূর্তগুলুতে তারা তোমাকে ঘিরে রাখে। সেখানে আমাদের ঠাঁই কোথায়? তুমি কেন বারবার জানতে চাও অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশলে আমার ঈর্ষা হয় কি না? জবাব পেলে তো?

৮১. বাঙালী লেখকেরা এখন sex ছাড়া আর কিছু জানে না? তোমার সঙ্গে আমার intellectual love.

Discovery of India-র মত তোমার চিঠিগুলো ছাপিয়ে দিলে কেমন হয়। ভয় পাচ্ছ?

It won't endanger the house

So that fire can't breakout I will put out the lamp.

৮২ একটা বেশ নতুন কথা শোনালে, 'আর কোনোদিন কিছু চাইব না।'

৮৩. যে বয়সটাতে মেয়েরা নানা স্বপ্ন দেখে, বন্ধু খোঁজে, বন্ধুর চাইতেও অন্তরঙ্গ কাউকে; সেই বয়সটা তোমাকে ঘিরেই আমার কেটে গেল, এখন আর কাউকেই মনে ধরে না। কাউকে ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না।

৮৪. মুবারক হো। দিয়ানে হেব্রের চিঠি পেলাম। সে সব আমায় জানিয়েছে। ওর চিঠি থেকে জানতে পারলাম, গত বছর এক সন্ধ্যায় কোনো একটি রেস্তোঁরায় তোমার সঙ্গে ওর আলাপ। দিয়ানে ছবি আঁকে। ছবি আঁকতে ভারতে এসছে। ভালই হল। ওর শরীরের মাপ, বয়স, চুলের রঙ যেভাবে লিখেছে আমার পড়তে লজ্জা করছিল। বিদেশী মেয়েরা বোধ হয় আমাদের মত শুধু কথার ফাঁসে আটকে থেকে ছটফট করে না। ওরা শররীকে জেবলে ধরে যাতে পুরুষরা গভীর অব্দি দেখতে পায়। আমার শুধু দুঃখ, কথাটা ওর কাছ থেকে জানতে হল। ওর দেশের ঠিকানাও আমাকে দিয়েছে, লিখেছে, আমি যেন নিশ্চয় একবার গিয়ে তোমাদের দুজনের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আসি। সামনের নভেম্বরেই তোমরা চলে যাচ্ছ।

---

* দিয়ানে হেব্রের ঠিকানা লেখা একটা চিরকুটও ছিল চিঠির বাণ্ডিলে:

DIANE HEBRE
66, *Ter* Av. Etienne Billieres
—3L—Toulouse
FRANCE